নাথপন্থ

শ্রীকল্যাণী মল্লিক

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা

উৎসর্গ

পরমপূজনীয় পিতৃদেব

স্বর্গীয় ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

স্মরণে

চৈত্র ১৩৫৭

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন

বিশ্বভারতী, ৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

মুদ্রাকর শ্রীসত্যপ্রসন্ন দত্ত

পূর্ব্বাশা লিমিটেড, পি ১৩ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা

৩·১

প্রায় সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে নাথ-সম্প্রদায় নামক যোগীদের ভারতব্যাপী খ্যাতি ছিল। এই যোগীগণের আসমুদ্রহিমাচল গতিবিধি থাকায় তাঁহাদের কীর্তি ও কাহিনী ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে অদ্যাপি বর্তমান। এই যোগী-সম্প্রদায়ে দীক্ষান্তে 'নাথ' পদবী যুক্ত করিবার রীতি ছিল; যথা, শ্রীমৎস্যেন্দ্রনাথ, শ্রীগোরক্ষনাথ, শ্রীজালন্ধরনাথ প্রভৃতি। তাই সাধারণ্যে ইঁহারা 'নাথযোগী' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। 'নাথ' অর্থে প্রভু, যোগিনীদের 'নাথনী' বলিত। নাথযোগীরা ব্রহ্মচারী ছিলেন, নাথনীরা অধিকাংশই বিধবা ছিলেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের লোকগণনায় ভারতে ৪৫,৪৬৩ নাথযোগীর সংখ্যা দেখা যায়, তৎপরে পৃথকভাবে ইঁহাদের সংখ্যা নির্ণয় করা হয় নাই।

এই যোগীদের অলৌকিক ক্ষমতা ছিল, তাই ইঁহাদের 'সিদ্ধ'ও বলা হইত, অর্থাৎ ইঁহারা যোগমার্গে সিদ্ধ ছিলেন। ইঁহাদের প্রচারিত ধর্মকে আধুনিক যুগে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নাম দিয়াছিলেন নাথপন্থ। বাংলাদেশের সহিত নাথযোগীদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় নাথপন্থের অনেক পুঁথি বাংলাভাষাতে রচিত হয়, সুদূর নেপালেও শ্রীমৎস্যেন্দ্রনাথ রচিত বাংলা পদ পাওয়া গিয়াছে। শ্রীমৎস্যেন্দ্রনাথ ছিলেন বাঙালি, তিনি পূর্বভারতের সমুদ্র-উপকূলে সন্দীপ বা চন্দ্রদ্বীপে জন্ম গ্রহণ করেন, মতান্তরে বরণা বঙ্গদেশে তাঁহার জন্ম। তবে তিনি বাঙালি ছিলেন, সে বিষয়ে কোনো মতভেদ নাই। ইহা বাঙালির গৌরবের কথা। গোরক্ষনাথের জন্ম সম্বন্ধে কোনো পুঁথিতে উল্লেখ পাওয়া যায় না, যোগীরা তাঁহাকে 'ঈশ্বর-সন্তান' বলেন। বাংলাভাষায় গোরক্ষ-রচিত পদ পাওয়া যায় নাই, তাঁহার গ্রন্থাদি অধিকাংশই হিন্দী, রাজস্থানী প্রভৃতি মিশ্রিত ভাষায় পাওয়া যায়। কথিত আছে, গোরক্ষের

রচনাবলী হিন্দী সাহিত্যের মূল উৎস স্বরূপ। অতএব গোরক্ষ বাঙালি ছিলেন না বলিয়াই মনে হয়। মৎস্যেন্দ্র ও গোরক্ষের রচনারূপে প্রচলিত সংস্কৃত গ্রন্থাদি আছে। মৎস্যেন্দ্র-রচিত কয়েকটি সংস্কৃত পুঁথি ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় নেপাল হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। নেপাল হইতে বাংলা পদাবলী সংগ্রহ শাস্ত্রীমহাশয়ের অন্যতম কীর্তি। তিনি তাহা 'হাজার বছরের পুরানো বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' নামে মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিয়াছেন। বাঙালি বৌদ্ধ ও শৈবতান্ত্রিক সিদ্ধেরা অপভ্রংশে সাধন সম্বন্ধীয় যে-সকল পদ রচনা করিতেন তাহা 'দোহা' নামে পরিচিত। ভাষাতত্ত্ববিদ্ ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই দোহাগুলিকে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম রূপ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। নাথযোগীদের মাহাত্ম্যসূচক অলৌকিক কাহিনী-সকল লোকমুখে গীত হইয়া 'গাথা' রূপে সর্বত্র প্রচারিত হয়। বাংলাদেশের উপরেও তাহার প্রভাব অকিঞ্চিৎকর ছিল না। বঙ্গভাষায় রচিত 'গোরক্ষবিজয়' 'গোপীচন্দ্রের গীত' 'ময়নামতীর গান' প্রভৃতি এখনও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। নাথযোগীদের মধ্যে মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথ প্রধান, তাঁহারা যে ঐতিহাসিক ব্যক্তি সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। শ্রীমৎস্যেন্দ্রনাথ নাথপন্থের আদি প্রবর্তক ও শ্রীগোরক্ষনাথ তাঁহার শিষ্য হইলেও গুরু অপেক্ষা তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। মৎস্যেন্দ্রনাথের আর-এক শিষ্যের নাম গাভুর সিদ্ধাই বা চৌরঙ্গীনাথ। গোরক্ষনাথের শিষ্যমধ্যে রানী ময়নামতী ও জালন্ধরনাথ প্রধান। ভর্তৃহরি প্রভৃতিও গোরক্ষের শিষ্য ছিলেন। জালন্ধরনাথ, নামান্তরে হাড়িপা, বঙ্গীয় রাজা গোপীচন্দ্রের গুরু ছিলেন, উভয়েই ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ভর্তৃহরি উজ্জয়িনীর রাজা ছিলেন, অতএব তাঁহারও ঐতিহাসিকতা আছে। তদ্ব্যতীত বঙ্গদেশে বহু শতাব্দী ধরিয়া যোগীদের বিভিন্ন গাথার মধ্য দিয়া বংশানুক্রমে

যে প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে তাহা হইতেও জানা যায় গোরক্ষনাথ মৎস্যেন্দ্রের শিষ্য ও ময়নামতীর গুরু ছিলেন ; এবং হাড়িপা গোরক্ষনাথের শিষ্য, রাজা গোপীচন্দ্রের গুরু ও ময়নামতীর গুরুভ্রাতা ছিলেন।

নাথ-সম্প্রদায়ের উদ্ভব

ভারতীয় নীতি অনুযায়ী নাথপন্থের উপদেষ্টাদের অযোনিজ উদ্ভব কল্পনা করা হয়, যথা, মৎস্যেন্দ্র মৎস্য হইতে জাত, গোরক্ষনাথের জন্ম গোময় হইতে, মতান্তরে মহাদেবের জটা হইতে ইত্যাদি। আগমসংহিতায় উল্লিখিত হইয়াছে, ঈশ্বর হইতে একাদশ রুদ্র ও তদীয় পত্নীর উদ্ভব হয়, তাঁহাদের বংশে আদিনাথ মীননাথ গোরক্ষনাথ প্রভৃতি মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। এই যোগীরা রুদ্রকুলজাত বলিয়া ইঁহাদের অনাদি বা শিবগোত্র, এবং শিব বা নাথ হইতে উৎপন্ন বলিয়া সকলেই নামের শেষে নাথ উপাধি যোগ করিবার অধিকারী। চন্দ্রাদিত্য পরমাগমে আছে সূর্যবংশীয় সুধন্বা রাজার কন্যা সূর্যবতী তপস্যাবলে মহাদেবের নিকট যে পুত্রলাভ করেন সেই পুত্রের নাম যোগনাথ; মীননাথ প্রভৃতি এই যোগনাথের পুত্র বলিয়া যোগী নামে খ্যাত। শিবের ন্যায় কর্ণে ছিদ্র করিয়া দীক্ষান্তে কুণ্ডল ধারণ এই যোগীদের বৈশিষ্ট্য, তাই ইঁহারা কানফাটা নামেও পরিচিত।

হঠযোগপ্রদীপিকা নামে হঠযোগের প্রাচীন গ্রন্থে যেসকল সিদ্ধপুরুষের নাম আছে তন্মধ্যে—

শ্রীআদিনাথ-মৎস্যেন্দ্র-শাবরানন্দ-ভৈরবাঃ।
চৌরঙ্গী-মীন-গোরক্ষ-বিরূপাক্ষ-বিলেশয়াঃ॥

প্রভৃতি যোগীদের নাম পাই, এইসকল যোগী হঠযোগ-মার্গে অদ্ভুত ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন। হঠযোগ-প্রভাবে কালজয়ী অর্থাৎ মৃত্যুঞ্জয়ী হইয়া ইঁহারা এখনও লোক হইতে লোকান্তরে বিচরণ করিতেছেন—

হঠযোগীদের গ্রন্থে এইরূপ বৃত্তান্ত আছে। শ্রীআদিনাথ বা শিব হঠযোগের আদি উপদেষ্টা। নাথপন্থীদের বিশ্বাস, শিব হইতেই নাথধর্ম জগতে প্রচারিত হয়, কালবশে উহা লুপ্ত হইবার উপক্রম হইলে মৎস্যেন্দ্র উহার পুনঃপ্রচার করেন, এবং গোরক্ষনাথ উহার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।

কিংবদন্তী

বঙ্গদেশে প্রবাদ আছে, পার্বতীর অনুরোধক্রমে শিব সমুদ্র-উপকূলে তাঁহাকে যোগতত্ত্বের রহস্য ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, কিন্তু নিদ্রিতা দেবী সে তত্ত্ব শুনিতে পাইলেন না। সমুদ্রজলে মৎস্যগর্ভ-মধ্যে একটি বালক সেই তত্ত্ব শুনিয়া মহাজ্ঞানের অধিকারী হইয়া বসিলেন। তখন নিরুপায় দেবাদিদেব মৎস্য-গর্ভ হইতে বালককে উদ্ধার করিয়া মৎস্যেন্দ্রনাথ নামে তাহাকে দীক্ষা দিয়া সেই যোগতত্ত্ব সাধারণ্যে প্রচার করিতে আদেশ দিলেন। তদবধি মৎস্যেন্দ্রনাথ কামরূপের গৃহে গৃহে সে ধর্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। মৎস্যেন্দ্র-রচিত কৌলজ্ঞান-নির্ণয় গ্রন্থে এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়। শ্রীমৎস্যেন্দ্রের শিষ্য যোগীশ্রেষ্ঠ গোরক্ষনাথ। তাঁহার সম্বন্ধে প্রবাদ আছে: কোনো পুত্রকামা রমণী মহাদেবের বরে কিঞ্চিৎ ভক্ষ্য প্রাপ্ত হইলেও অবিশ্বাস করিয়া তাহা গোময়ে নিক্ষেপ করে। দ্বাদশ বৎসরান্তে মহাদেব পুত্র-অনুসন্ধানে আসিলে গোময়-মধ্যে তাহাকে পান; তখন মহাদেব তাহাকে গোরক্ষ নাম দিয়া মৎস্যেন্দ্রের শিষ্য করিয়া দেন। এই গোরক্ষের নামেই গোরক্ষপুর নামক স্থানের প্রসিদ্ধি। নেপালের মুদ্রায় শ্রীগোরক্ষের নাম অঙ্কিত থাকে, সেখানে তাঁহার পশুপতিনাথের তুল্য সম্মান।

শ্রীগোরক্ষনাথের শিষ্যা রানী ময়নামতী আমাদের বঙ্গীয় রাজা গোপীচন্দ্রের মহাতপস্বিনী মাতা। কুমিল্লায় ময়নামতীর পাহাড় এখনও

বর্তমান। গোরক্ষনাথ বা গোর্খনাথ বিভূতিবলে শূন্যে ভ্রমণকালে এক সতী কন্যার সন্ধান পান, এই কন্যার নাম ছিল শিশুমতি। গোর্খনাথ তাহাকে দীক্ষা দিয়া ময়নামতী নাম রাখিলেন। এই কন্যাই পরে মেহের কুলের রানী ময়নামতী নামে নিজ অলৌকিক যোগবলের জন্য প্রসিদ্ধা হন। নানা রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার গোদা যমকে তাড়না করা প্রভৃতি কাহিনীর সহিত পাশ্চাত্য দেশের উপাখ্যানের আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখা যায়। মনে হয়, সেই যুগে অলৌকিক উপাখ্যানের উপর সকলের আস্থা ছিল।

গোরক্ষবিজয় গ্রন্থে মৎস্যেন্দ্রের আর-এক শিষ্যের নাম আমরা পাই, তিনি 'গাভুর সিদ্ধাই' অর্থাৎ যুবক সিদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহার গুরুদত্ত নাম চৌরঙ্গীনাথ। প্রবাদ আছে, ইহার পিতা বঙ্গদেশের পাল রাজাদের অন্যতম রাজা ছিলেন। বিমাতার অসন্তোষের কারণ হইয়া রাজপুত্র তাঁহার আদেশে চারিহস্তপদহীন অবস্থায় নগর বাহিরে পরিত্যক্ত হইলেন। এইরূপ অবস্থায় মৎস্যেন্দ্র কর্তৃক তিনি উদ্ধারপ্রাপ্ত হইয়া নাথযোগী হইলেন, এবং চারিহস্তপদহীনতার স্মারকস্বরূপ চৌরঙ্গীনাথ নামে পরিচিত হইলেন। কলিকাতার চৌরঙ্গী চৌরঙ্গীনাথের নামে হয় এবং কালীঘাটের কালী গোরক্ষনাথ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়, কিংবদন্তী-রূপে ইহা চলিয়া আসিতেছে।

নেপালে প্রাপ্ত গোবিন্দচন্দ্রের সন্ন্যাস নাটকে জালন্ধরের যে বৃত্তান্ত আছে তাহাতে বুঝা যায়, জলন্ধর দেশে তিনি জালন্ধরী নৃপতি নামে খ্যাত ছিলেন এবং সাত শত রানীর মায়া কাটাইয়া তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। পুঁথিটি সপ্তদশ শতাব্দীর, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে উহা রক্ষিত হইয়াছে। অগ্নিদেবতার বরে হস্তিনাপুরের অপুত্রক রাজার পুত্ররূপে জালন্ধর জন্মগ্রহণ করেন, এইরূপ বৃত্তান্তও আছে। যোধপুর-রাজ মানসিংহের উপর জালন্ধরনাথ কৃপা করেন এবং উজ্জয়িনীর রাজা

ভর্তৃহরিও জালন্ধরের শিষ্য হইয়া রাজ্যত্যাগ করেন। সিদ্ধসাহিত্যে ভর্তৃহরির নাম বিচারনাথ। এই ভর্তৃহরির ভগিনী ময়নামতীই বঙ্গীয় গোপীচন্দ্রের মাতা, এবং জালন্ধরনাথ গোপীচন্দ্রের গুরু। বঙ্গীয় কাব্যে জালন্ধরনাথ হাড়িপা নামেই প্রসিদ্ধ।

গোরক্ষ কতিপয় বালকের অনুরোধে মৃত্তিকামূর্তিতে প্রাণসঞ্চার করিলে গহনীনাথের জন্ম হয়। বালুকারাশির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া মৎস্যেন্দ্র কর্তৃক দীক্ষিত হইয়া চর্পটনাথ প্রসিদ্ধ হন, ইত্যাদি নাথ-যোগীদের সম্বন্ধে বহু কিংবদন্তী রহিয়াছে।

বঙ্গসাহিত্যে সিদ্ধদের যে জন্মবৃত্তান্ত পাওয়া যায় তাহা এইরূপ: অনাদ্যের শরীর হইতে শিব যোগীরূপ ধরিয়া জন্মিলেন, নাভিতে মীননাথ, হাড় হইতে হাড়িপা, কর্ণ হইতে কানফা, জটাভেদ করিয়া গোর্খনাথ বাহির হইলেন, গাভুর সিদ্ধাই অতি খরতর হইলেন, অবশেষে জগৎ-মাতারূপে গৌরী জন্মগ্রহণ করিলেন। পূর্বে হাড়িপা, দক্ষিণে কানফা, পশ্চিমে গোর্খ ও উত্তরে মিনাই বা মীননাথ গমন করিলেন— গোরক্ষ-বিজয় গ্রন্থে এইরূপ বর্ণনা পাই।

শ্রীমৎস্যেন্দ্রনাথ ও শ্রীগোরক্ষনাথের ধর্মমত

বৌদ্ধযোগী ৮৪ সিদ্ধদের যে নামের তালিকা ও বংশবৃক্ষ পাওয়া যায়, তাহাতে শবর বিরূপাক্ষ ভৈরবাদি হঠযোগীর নাম আছে; আবার মীননাথ গোরক্ষনাথ প্রভৃতি নাথসিদ্ধদেরও নাম আছে।

সাধারণত নাথসিদ্ধেরা নবনাথ নামে প্রসিদ্ধ, এই নবনাথের নামের তালিকায় মতভেদ থাকিলেও আদিনাথ মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথের নাম সাধারণ। মীননাথ ও মৎস্যেন্দ্রের পিতাপুত্র সম্বন্ধ, কিংবা উভয়েই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি সে বিষয়েও মতদ্বৈধ আছে। আমরা তাঁহাকে এক ব্যক্তি বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছি, শাস্ত্রীমহাশয়

সংগৃহীত বাংলা পদের রচয়িতা লুইপাদও আমাদের মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্র। বৌদ্ধযুগের সিদ্ধ ও সাহিত্যের সহিত নাথদের নাম যুক্ত হইয়া পড়ায় অনেকেই ভ্রান্তিবশত তাঁহাদের বৌদ্ধযোগী বলিয়াছেন। কিন্তু নাথেরা বৌদ্ধ ছিলেন না, তাঁহারা ছিলেন শৈব। প্রথমত, তাঁহারা শিব-গোরক্ষ মন্ত্র জপ করেন ও শিবের ন্যায় কর্ণে কুণ্ডল ধারণ করেন; তাঁহাদের তীর্থাদিও শৈবতীর্থ, ভৈরব কালী প্রভৃতির তাঁহারা উপাসক। মৎস্যেন্দ্র শৈব যোগীর বেশেই নেপালে শৈবধর্ম প্রচার করিতে যান এবং তাঁহার রচিত কৌলজ্ঞান-নির্ণয় নামক পুঁথিতে বৌদ্ধধর্মের উল্লেখ মাত্র নাই। পরবর্তীকালের পুঁথিমধ্যেও বৌদ্ধধর্মের কোনো কথা পাওয়া যায় না, শিব ও শক্তির কথাই পাওয়া যায়। অতএব নাথদের বৌদ্ধ বলা সমীচীন নহে। সর্বোপরি মৎস্যেন্দ্র কৈবর্ত হইয়া মৎস্যহত্যায় বাধ্য ছিলেন, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে জীবহত্যা নিষিদ্ধ। কথিত আছে, গোরক্ষনাথ পূর্বে বৌদ্ধ ছিলেন। স্বধর্ম ত্যাগ করায় নেপালী বৌদ্ধেরা তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট, তাই নেপালী বৌদ্ধেরা মৎস্যেন্দ্রের রথযাত্রা মহাসমারোহে করিলেও গোরক্ষনাথকে উচ্চস্থান দেন না। এ বিষয়ে বক্তব্য গোরক্ষনাথ-রচিত কায়াবোধ গ্রন্থের একটি বচনে তাঁহাকে পশ্বারম্ভক বা পশুহত্যাকারী মনে হয়, সে ক্ষেত্রে তাঁহার পক্ষেও বৌদ্ধ হওয়া সম্ভব নহে। নেপালের মুদ্রায় তাঁহার নাম অঙ্কিত থাকা ও পশুপতিনাথের তুল্য সম্মান পাওয়া অশ্রদ্ধার নিদর্শন নহে। অবশ্য পশুপতিনাথ নেপালী হিন্দুদেরই দেবতা। মৎস্যেন্দ্র শৈব যোগী হইয়াও নেপালী বৌদ্ধদের মধ্যে চতুর্থ বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর অবতার-রূপে উপাস্য হইলেন কিরূপে, তাহাই বিস্ময়ের বিষয়। অবলোকিতেশ্বরের বীজমন্ত্র অদ্যাপি বৌদ্ধগণ উচ্চারণ করিতেছেন। খৃষ্টীয় ধর্মের আদি-যুগে পরম তপস্বী ও ঐন্দ্রজালিক অবলোকিতেশ্বরের বা লোকেশ্বরের মতবাদ প্রচলিত ছিল। নেপালে মৎস্যেন্দ্রের শৈব বিগ্রহও আছে,

এবং সেস্থলে সপ্তদশ শতাব্দীর এক শিলালিপিতে আছে, 'যোগীশ্রেষ্ঠরা তাঁহাকে মৎস্যেন্দ্রনাথ বলেন, বৌদ্ধেরা তাঁহাকে লোকেশ্বর বলেন, যিনি স্বরূপতঃ ব্রহ্ম সেই পুরুষের জয় হউক'।

নাথযোগীদের মধ্যে জাতিভেদ না থাকিলেও শ্রেণীভেদ ও মতভেদ নাই ইহা বলা চলে না। ইঁহাদের প্রধানত দ্বাদশ শাখা আছে, তাহা দ্বাদশপন্থ নামে পরিচিত। এই দ্বাদশপন্থীরাই কানফাটা সম্প্রদায় নামে খ্যাত। হরিদ্বারে ভেক-বারহ্-পন্থ নামে ইঁহাদের কার্যনির্বাহক সমিতি আছে, দ্বাদশ বৎসরান্তে কুম্ভমেলায় বিভিন্ন শ্রেণী হইতে ইহার দ্বাদশ সভ্য নির্বাচিত হন। তাঁহারা মঠপরিদর্শন মোহন্তনির্বাচন আদি কার্য করেন। ভারত সরকারও এই দ্বাদশ যোগীর অনুমোদন ব্যতীত মোহন্তনির্বাচন আদি যোগীসম্বন্ধীয় বিবাদে হস্তক্ষেপ করেন না।

এখন মৎস্যেন্দ্রাদির ধর্মমত কি ছিল সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

নাথসিদ্ধেরা যোগসাধনা করিতেন বলিয়া ইঁহাদের মার্গকে যোগ-মার্গ অবধূত-মার্গ সিদ্ধ-মার্গ প্রভৃতি বলা হইয়া থাকে। তথাপি মৎস্যেন্দ্রনাথ হঠযোগের আদিপ্রচারকর্তা ও শিব ইহার আদিবক্তা এইরূপ প্রবাদ আছে। হঠযোগ গ্রন্থে মৎস্যেন্দ্রাসনম্ গোরক্ষাসনম্ প্রভৃতি থাকাতে এই প্রবাদের মূলে কিঞ্চিৎ সত্য নিহিত থাকা বিচিত্র নহে, ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী এই মত পোষণ করেন। গোরক্ষ-রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ গোরক্ষবোধ গ্রন্থের কয়েকটি শ্লোকে নাথযোগীদের হঠযোগ সাধনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। শব্দ বা নাদের দ্বারা মন্ত্রচৈতন্য সাধনা তন্ত্রেরই কথা; তাই গোরক্ষনাথের নাদানুসন্ধান এই শ্রেণীর হইলেও উপনিষদেও শব্দযোগের কথা পাওয়া যায়। অতএব ডক্টর মোহন সিং গোরক্ষনাথাদিকে হঠযোগী বলিয়া স্বীকার করেন না। বাস্তবিকপক্ষে মৎস্যেন্দ্র ও লুইপাদ যোগীকে অভিন্ন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলে নাথযোগীদের

হঠযোগী বলা যায় না। কারণ লুইপাদ প্রভৃতি সিদ্ধেরা সহজ পথের সাধক ছিলেন। কষ্টসাধ্য আসনাদি দ্বারা কুণ্ডলিনীর প্রবোধন তাঁহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল না। ধ্যান সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। ডক্টর মোহন সিংএর মতে গোরক্ষনাথের যোগ পরবর্তী কালের উপনিষদের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। জৈসী-কৃত পদুমাবৎ কাব্যে গোরক্ষের শ্রুত-যোগকথা আছে, গোরক্ষবোধ প্রভৃতি গ্রন্থ তৎপূর্বের। নাথ-সম্প্রদায়ে প্রচলিত ও নাথযোগীদের অনুমোদিত শিবসংহিতা, ঘেরণ্ডসংহিতা গ্রন্থাদিতে মৎস্যেন্দ্রাসন জালন্ধরবন্ধ কুণ্ডলিনীতত্ত্ব শূন্যবাদ প্রভৃতি এবং বজ্রোলী অমরোলী মুদ্রাদির বর্ণনা আছে। এইসকল সাধন হঠযোগের অঙ্গবিশেষ। আবার নাথ-সম্প্রদায়ের অমনস্ক যোগবীজম্ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে নাথযোগীদের সাধনার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে দ্বৈতাদ্বৈতবিলক্ষণ সমতত্ত্বরূপ নাথ-স্বরূপকে জ্ঞানযুক্ত যোগ দ্বারা লাভ করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, যোগাগ্নি দ্বারা সপ্ত ধাতুময় পার্থিব দেহকে জয় করিয়া অজর অমর হইবার কথা আছে, প্রাণাপানের সংযোগেই যোগাগ্নি দ্বারা পার্থিব দেহ দগ্ধ করা যায়।[১] প্রাণাপানের যোগ-কথা হঠযোগেরই প্রতিপাদ্য বিষয়, কারণ

হকার কীর্তিতঃ সূর্যষ্ঠকারশ্চন্দ্র উচ্যতে, সূর্যাচন্দ্রমসোর্যোগ্য হঠযোগো নিগদ্যতে

ইহাই হঠযোগের সংজ্ঞা, ইহার একটি প্রাণ, অপরটি অপান; একটি রেচক অপরটি পূরক। নাথযোগীদের সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি পুঁথিতেও হঠযোগ-সংজ্ঞা বজ্রোলী-মুদ্রা খেচরী-মুদ্রা কুণ্ডলিনী-সাধন প্রভৃতির কথা পাওয়া যায়। প্রাণায়ামাদির পূর্ণ বিবরণও ইহাতে আছে। গোরক্ষ বলিয়াছেন—

জীবতি হি উলটি মরণা

১ যোগবীজ, ৭০ সংখ্যক শ্লোক প্রভৃতি

এই উল্টাসাধনই নাথযোগীদের বৈশিষ্ট্য, এই সাধনের নামান্তর কায়াসাধন। গোরক্ষবিজয় গ্রন্থেও পাই—

কায়া সাধ, কায়া সাধ, মাদলে হেন বোলে।

এই উল্টা মার্গে শরীরস্থ রসাদিকে নীত করিলে সাধকের মৃত্যুঞ্জয় অবশ্যম্ভাবী। ইহা দ্বারা নাথযোগীদের পূর্ণ সংযমেরই পরিচয় পাওয়া যায়, অতএব তাঁহাদের সাধনমার্গে 'শক্তি'র কোনো স্থান ছিল না, ইহা নিশ্চিত।

কথিত আছে, সন্ত কবি দাদূ এক সময়ে নাথযোগী ছিলেন, তখন তাঁহার নাম ছিল কুম্ভারীপাব্, সিদ্ধ সাহিত্যে বঙ্গীয় রাজা গোপীচন্দ্রের নাম শৃঙ্গারীপাব্। এই 'পাব্' শব্দ হইতে বৌদ্ধ পা-সিদ্ধদের সহিত নাথযোগীদের সম্বন্ধ ছিল এইরূপ ধারণা হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু 'পা' শব্দটি কি 'ফা' শব্দের রূপান্তর? ত্রিপুরার রাজাদের আদিপুরুষের ফা উপাধি দৃষ্ট হয়, মহারাজ ত্রিপুরেশ্বরের জন্ম 'শিব-অংশ-সম্ভূত' বলিয়া ইতিহাসে বর্ণিত আছে, ত্রিপুরার রাজারাও পূর্বে শৈব ছিলেন।[২] গোপীচন্দ্রের রাজধানী ত্রিপুরারাজ্যের অন্তর্গত পাটিকা নগরে ছিল। বর্তমানে ত্রিপুরা জিলায় পাটিকারা নামে পরগণা আছে। ত্রিপুরার ভাষায় ফা অর্থে পিতা। গোপীচন্দ্রের গুরুর নাম ছিল হাড়িফা ব হাড়িপা, ইনি ঐ রাজ্যে নীচকর্ম করিতেন, কিন্তু যোগসিদ্ধি-বলে চন্দ্র ও সূর্যকে কর্ণের কুণ্ডল করিয়া রাখিয়াছিলেন অর্থাৎ প্রাণ ও অপানবে তিনি সম্পূর্ণ জয় করিয়াছিলেন। নাথযোগীদের মধ্যে কানফা ব কাণিপা অন্যতম, অতএব ফা উপাধি হইতে পা বা পাব্ হওয়া সম্ভব কি না ইহা অনুসন্ধানের বিষয়। মতান্তরে পা শব্দটি তিব্বতী, ইহার অং অধিকারী। এই পা-পন্থীরা শৈব ছিলেন। কথিত আছে, জালন্ধর নাথপন্থ ত্যাগ করিয়া পা-পন্থের প্রবর্তন করেন। কাণিপা, গোপীচন্দ্র

২ গোরক্ষবিজয়, ভূমিকা পৃ ৪

প্রভৃতি এই পন্থের। চট্টগ্রাম কুমিল্লায় চন্দ্রনাথ আদিনাথ ও ময়নামতীর নামে পাহাড় ও মন্দির আছে। এইসকল মন্দিরে নাথপূজারী আছে। ইহা দ্বারা নাথ-সম্প্রদায়ের সহিত গোপীচন্দ্রের বংশের সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীমৎস্যেন্দ্রনাথ

শ্রীমৎস্যেন্দ্রনাথ বরণা বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করেন ও কামরূপে তাঁহার শাস্ত্র প্রচার করেন, এইরূপ বৃত্তান্ত মৎস্যেন্দ্র-রচিত কৌলজ্ঞান-নির্ণয় নামক পুঁথিতে পাওয়া যায়। তিব্বতী মতে লুইপাদ আদিসিদ্ধরূপে পরিচিত হন এবং বাংলায় চর্যা ও গ্রন্থাদি রচনা করেন। শাস্ত্রী-মহাশয় লুইপাদ প্রভৃতির পদ সংগ্রহ করিয়া 'বৌদ্ধগান ও দোহা' নামে প্রচারিত করায় সিদ্ধেরা সকলেই বৌদ্ধ ছিলেন এই ভ্রান্ত ধারণা হওয়া সম্ভব। মৎস্যেন্দ্র অর্থে মৎস্যের রাজা, তিব্বতী ভাষায় লুই অর্থে মৎস্যোদর, ভারতীয় মতেও মৎস্যেন্দ্র মৎস্যোদর হইতে উদ্ধার-প্রাপ্ত। তিব্বতী চিত্রে মৎস্যেন্দ্রকে মৎস্য-পরিবৃত হইয়া মৎস্য-অন্ত্র আহারে রত দেখা যায়। শাস্ত্রীমহাশয় তাঁহার বেণের মেয়ে পুস্তকে রাজার গুরু লুইপার সুন্দর চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। মৎস্যাবতার-বন্দনা নামে মূলে প্রাচীন বাংলায় রচিত একটি স্তোত্র মহারাষ্ট্রে পাওয়া গিয়াছে, এই স্তোত্রটি উপরোক্ত দোহাগুলির সমসাময়িক। বৌদ্ধ ও শৈব তান্ত্রিক সিদ্ধাচার্যেরা অপভ্রংশে সাধনসম্বন্ধীয় যেসকল রহস্যময় পদ রচনা করিয়াছিলেন, তাহারই নাম দোহা; এই পদকর্তারাই সর্বপ্রথম সাধারণের বোধগম্য ভাষায় পদ রচনা করেন। এইরূপেই হাজার বৎসর পূর্বে বাংলা সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

গোরক্ষনাথ-রচিত গ্রন্থ ও পদ্যাদিতে অপভ্রংশমিশ্রিত একটি বিশেষ ভাষা দেখা যায়। হিন্দী মহারাষ্ট্রী রাজস্থানী মিশ্রিত হইয়া যে অপূর্ব

ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা তৎকালীন রহস্যবাদীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কবীর নানকাদির ভাষার সহিত ইহার মিল আছে। ডক্টর মোহন সিং গোরক্ষনাথকে পূর্ববঙ্গের অধিবাসী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহিলেও বাংলা ভাষায় তাঁহার কোনো পদ বা পুঁথি পাওয়া যায় নাই, এ কথা স্বীকার করিতে হইবে। অতএব তিনি বাঙালি ছিলেন কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

গোপীচন্দ্র ও ময়নামতীর কাহিনী

বঙ্গদেশের রাজা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসগ্রহণের করুণ কাহিনী কেবল বঙ্গদেশে নহে সমগ্র ভারতে প্রচলিত আছে। সিহরকী গোপীচান্দ্, পদুমাবৎ, গোপীচন্দ্র রাজাকে খেল, গোপীচান্দ নাটক প্রভৃতি কাব্য বাংলাদেশের বাহিরেই রচিত হয়। গোপীচন্দ্রের মাতা ময়নামতী তাঁহার গুরু গোর্খনাথের কৃপায় মহাজ্ঞানের অধিকারিণী হন, সেই জ্ঞানবলে পুত্রের স্বল্পায়ু দেখিয়া তাহাকে হাড়িপার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাস লইতে মাতা বাধ্য করেন। হাড়িপার নিকট মহাজ্ঞান লাভ করিলে তবেই পুত্র দীর্ঘজীবী হইবে, নহিলে উনবিংশ বৎসর বয়সে তাহার নিশ্চিত মৃত্যু, এ কথা যোগবলে ময়নামতী জানিতে পারেন। কিন্তু একমাত্র পুত্রের উপর সন্ন্যাসগ্রহণের নিষ্ঠুর নির্দেশ, বিশেষত তাঁহারই রাজ্যের সামান্য ব্যক্তির শিষ্যত্ব গ্রহণ, জনসাধারণের মধ্যে যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে, তাহার ফলে চৈতন্যদেবের গৃহত্যাগের ন্যায় করুণ হইয়া এই কাহিনী সর্বভারতে প্রচারিত হয়। তৎসহ গোপীচন্দ্রের দুই মহিষী অদুনা-পদুনার বিলাপকাহিনীও গীতিকা-রচনার বিষয়বস্তু হইয়া উঠিল। এখনও তরুণ রাজপুত্রের গৃহত্যাগের মর্মস্পর্শী কাহিনী রংপুর জেলার যোগীরা ভিক্ষার্থে বাহির হইলে গুপীযন্ত্রের সাহায্যে গাহিয়া থাকেন।

বোম্বাই অঞ্চলের যোগীরা প্রায়ই নিরক্ষর, সম্পূর্ণ গাথা আবৃত্তি করিতে পারে এমন যোগী এখন দুর্লভ। এই যোগীরা শিবগোত্রীয় ছিলেন, প্রবাদ আছে হাড়িপা দেবীর অভিশাপে শূদ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া গোপীচন্দ্রের রাজ্যের হাড়ির কাজ করিলেও যোগমার্গে মহাসিদ্ধ ছিলেন। ওড্ডিয়ানে থাকিয়া তিনি যোগধর্ম শিক্ষা করেন, এই ওড্ডিয়ানের অবস্থিতি সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

গীতিকাব্যে আছে হাড়িপার রাজার বাগানের ডাব খাইবার ইচ্ছা হইল অমনি

> **এক হুঙ্কার সিদ্ধাত্র দিলেক এড়িয়া।**
> **উনশত নারিকেল পড়ে জীখন শৌড়িয়া॥**
> **শাঁশ নারিকেল খাইয়া গাছে লাগাএ মালা।**

হাড়িপা তাহার অদ্ভুত ক্ষমতা বলে এক হুংকারে গাছের ফল নামাইয়া শাঁস খাইয়া মালাগুলি আর হুংকারে গাছে তুলিলেন। আহারের পর নিদ্রার জন্য গঙ্গাদেবী স্বয়ং হাড়ি-সিদ্ধাকে খাট আনিয়া দিলেন। এমন কি মৃত মনুষ্যও হাড়িপার লাথি খাইয়া জীবিত হইয়া উঠিল। কিন্তু এ হেন গুরুর শিষ্য হইতে গোপীচন্দ্র সহজে সম্মত হন নাই, মাতার সহিত হাড়িপার কোনো ষড়যন্ত্র আছে সন্দেহ করিয়া মাতাকে অগ্নি-পরীক্ষা, জলপরীক্ষা, বিষপানের পরীক্ষা, কেশের সাঁকো দিয়া হাঁটিয়া পার হইবার পরীক্ষা দিতে পুত্র একপ্রকার বাধ্য করিলেন। মাতা স্মিতহাস্যে গুরু গোর্খনাথকে স্মরণ করিয়া সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। তখন পুত্র একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া যোগীর 'শূন্য কাঁথা শূন্য ঝুলি' কাঁধে লইয়া দেশান্তরী হইলেন, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান পাইলে সবই শূন্য মনে হয়, ইহাই সূচিত হইতেছে। পথে যাইতে যাইতে হাড়িপা মদের গন্ধে আকুল হইয়া শিষ্যকে এক নটীর নিকট বন্ধক রাখিয়া মদের জন্য নয় কড়া কৌড়ি আদায় করিলেন। এদিকে

গোপীচন্দ্র বারো বৎসর ধরিয়া অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে লাগিলেন, কিন্তু নটীর সহিত আমোদে রত হইতে রাজি হইলেন না, নটীকে বলিলেন—

গুরু কহিবে আমাকে ভণ্ড তপস্বী।
তত্ত্বজ্ঞানী গুরু আমার নাম জলন্ধর।
তবে জ্ঞান নাহি দিব না হব অমর॥[৩]

অবশেষে শুকপক্ষীর হাতে মাতার নিকট নিজ কষ্টের সংবাদ পাঠাইলেন। ময়নামতী হাড়িপাকে পুত্রের সন্ধানে পাঠাইলে হাড়িপা নটীকে নয় কড়া কৌড়ি দিয়া শিষ্যকে মুক্ত করিলেন। তৎসহ ক্রুদ্ধ হইয়া নটীকে অভিশাপ দিলেন—

বাদুর হইয়া রহ ভুবন ভিতর।

গোপীচন্দ্র স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া রানীদের সহিত মিলিত হইলেন।

মৎস্যেন্দ্রের কাহিনীতে মৎস্যেন্দ্র যখন কদলীরাজ্যে ষোলো শত রানীর মোহপাশ হইতে গোরক্ষ কর্তৃক উদ্ধারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখনও গোরক্ষনাথের অভিশাপে সেই কদলীদেশের ষোলো শত রানী

বাদুর হইয়া সব কদলি গেল উড়ি

এবং গোরক্ষনাথসহ মৎস্যেন্দ্র স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া যোগ সাধনে বসিলেন।

পূর্বভারতে কীর্তি ও কাহিনী

একদা এই প্রবল পরাক্রান্ত যোগীজাতি বঙ্গদেশে ও পূর্বভারতে প্রভুত্ব করিয়া গিয়াছেন। ইহাঁরা রাজাদের গুরু ছিলেন, সন্ন্যাসী হইলেও ধর্মযুদ্ধাদিতে যোগ দিতেন, আবার দর্শনের গ্রন্থ ও পদ্যাদি রচনা করিতেন। রংপুর৷ ময়মনসিংহ বাখরগঞ্জ নোয়াখালি ঢাকা

---

৩ গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস, পৃ ৪৯০

ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলে এখনও লক্ষাধিক যোগীর বাস থাকিলেও তাঁহাদের পূর্ব গৌরব অক্ষুন্ন নাই। দারিদ্র্যবশত উচ্চশিক্ষায় বঞ্চিত হইলেও তাঁহাদের মধ্যে তিন সহস্রাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী আছেন। গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত এখন ইঁহারা তন্তুবায়, মনিহারী, চুণবিক্রয় প্রভৃতি ব্যবসায় অবলম্বনে বাধ্য হইয়াছেন। এক্ষণে এইসকল যোগীর উপাস্য দেবতা ধর্মঠাকুর। গোরক্ষনাথ প্রভৃতি ইঁহাদের নিকট স্মরণীয় মহাপুরুষ মাত্র। এই ধর্মঠাকুরের কোনো প্রতিমা নাই, ইঁহার পূজায় হংস-পারাবাতাদি উৎসর্গ করা হয়, কিন্তু নিহত করা হয় না। যোগীদের স্বজাতীয় পুরোহিত ধর্মের পূজা করেন। ধর্মঠাকুরের নামান্তর নিরঞ্জন অর্থাৎ নির্মল, এই ধর্মপূজা হিন্দুধর্মের সহিত বৌদ্ধধর্মের শূন্যবাদের মিশ্রণে উৎপন্ন। পরবর্তীকালে ইহাতে নাথপন্থের কিছু মিশিলেও লৌকিক ধর্মরূপে ইহা রহিয়া গিয়াছে, নাথধর্মের মত বিস্তার লাভ করে নাই। পালরাজাদের সময় হইতেই বঙ্গদেশে এই ধর্মপূজার প্রচলন হয়, ইহার প্রবর্তক রামাই পণ্ডিত জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। বল্লালচরিতে যোগীগণের পুরোহিতদিগকে রুদ্রজ ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে। কিন্তু রামাই জাতিবর্ণবিরোধী ধর্মপূজায় রত ছিলেন বলিয়া সমাজচ্যুত হন।[৪] রামাই সম্ভবত দশম শতাব্দীর লোক। নাথযোগী চৌরঙ্গীনাথের পিতা সম্ভবত বঙ্গীয় পালরাজাদের মধ্যে দেবপাল নামে পরিচিত, ইঁহার ভগিনী ময়না রামাই পণ্ডিতকে উৎসাহিত করিতেন, এইরূপ কথা প্রচলিত আছে। তথাপি দেখা যাইতেছে, বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ক্রমশ লুপ্ত হইলেও এখনও বঙ্গদেশে নাথ-উপাধিধারী যোগীজাতি তাঁহাদের স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছেন। নাথধর্মের জীবনীশক্তির ইহাই সর্বাপেক্ষা উত্তম প্রমাণ।

৪ শূন্যপুরাণ ভূমিকা, পৃ ৮৮

পশ্চিমভারতে বিস্তার

পূর্বভারত ব্যতীত পশ্চিমভারতেও নাথধর্মের যথেষ্ট বিস্তার ও প্রতিপত্তি হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রের সুবিখ্যাত গীতাভাষ্য-রচয়িতা শ্রীজ্ঞানেশ্বর মহারাজ নাথ-সম্প্রদায়ের। মহারাষ্ট্রে তিনি ও তাঁহার অগ্রজ নিবৃত্তিনাথ নাথধর্ম প্রচার করেন। ১২৭৫ খৃষ্টাব্দে জ্ঞানদেবের জন্ম হয়, পরে ইহার নাম হয় জ্ঞানেশ্বর। ইঁহার রচিত সুললিত গীতাভাষ্য জ্ঞানেশ্বরী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। মাত্র একবিংশতি বৎসর বয়সে ইনি জীবন্ত সমাধি গ্রহণ করেন। কথিত আছে, তাঁহার ইচ্ছায় তাঁহার পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহাকে সমাধিস্থ করেন। পিতা সন্ন্যাস গ্রহণের পর পুনরায় গুরুর আদেশে গার্হস্থ্য ধর্ম অবলম্বন করিলে নিবৃত্তিনাথাদির জন্ম হওয়ায় ইঁহারা সপরিবারে সমাজচ্যুত হন। কিন্তু কালে জ্ঞানদেবের অদ্ভুত যোগবল ও জ্ঞানভাণ্ডারের নিকট সকলকে মস্তক নত করিতে হয়। জ্ঞানদেব রচিত জ্ঞানেশ্বরী নামক গীতাভাষ্যে যে ভাষার নৈপুণ্য, ভাবের গাম্ভীর্য, অলংকারচাতুর্য ও দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি দেখা যায়, তাহা মহারাষ্ট্র সাহিত্যে এক যুগ পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে করাচির অনতিদূরে হিংলাজ কোটেশ্বর প্রভৃতি স্থানে নাথদিগের প্রসিদ্ধ মঠাদি আছে। এইসকল তীর্থভ্রমণ শেষ হইলে তাহার স্মারকচিহ্নরূপে সেখানে দক্ষিণ বাহুতে 'যোনিলিঙ্গ' অঙ্কিত করার প্রথা আছে। কচ্ছপ্রদেশের ধীনোধর মঠও প্রসিদ্ধ; কথিত আছে, নাথযোগী ধর্মনাথ স্বীয় পাপক্ষয়ের নিমিত্ত দ্বাদশ বৎসর এইস্থানে মস্তকোপরি দণ্ডায়মান থাকিয়া তাঁহার অসীম ধৈর্যের পরীক্ষা দেন, ধীনোধর অর্থে সহিষ্ণুতার ধারক। ধর্মনাথ ১৩৮২ খৃষ্টাব্দে পেশোয়ার হইতে কচ্ছে আসিয়া এই মঠ স্থাপন করেন। বোম্বাইপ্রদেশে সাতপুরা

প্রভৃতি স্থানে গোরক্ষগড় ও মচ্ছিন্দরগড় নামে দুইটি দুর্গ আছে। গোরক্ষাদির নামে মন্দির, উষ্ণপ্রস্রবণাদিরও অভাব নাই।

বাবা গম্ভীরনাথ

ভারতের উত্তরে পাঞ্জাবে টিলা নামক স্থানে গোরক্ষনাথীদের সর্বশ্রেষ্ঠ মঠ আছে। ইহা ঝিলমের পঁচিশ মাইল দূরে অবস্থিত এবং গোরক্ষটিলা নামে প্রসিদ্ধ। ইহার উচ্চতা ৩,২৪২ ফুট, ইহার পর্বতগাত্র অমসৃণ ও দুরারোহ। এই স্থান হইতে দৃষ্ট হিমালয়-দৃশ্য অতীব মহান। গোরক্ষনাথ এ টিলায় দেহরক্ষা করেন, এরূপ প্রবাদ আছে। বাল্মীকি-কন্যার বিবাহবর্ণনায় এই টিলার উল্লেখ পাওয়া যায়, অতএব এই টিলা গোরক্ষপূর্ব যুগেরও বহু প্রাচীন তীর্থ বিশেষ। সম্রাট আকবরও ইহার ব্যয় নির্বাহার্থে কয়েকটি গ্রাম অর্পণ করেন। কাশ্মীর, নেপাল, সিকিম, নেপালের অনতিদূরে তুলসীপুর, নৈনিতাল, আলমোরা, হরিদ্বার প্রভৃতি স্থানে গোরক্ষনাথ ও মৎস্যেন্দ্রনাথের সহিত যুক্ত নানা স্থান, মঠ, মন্দির প্রভৃতি আছে। যুক্তপ্রদেশের চুনারে ভর্তৃহরির দুর্গ আছে, রাজা ভর্তৃহরি সিংহাসন ত্যাগ করিয়া গোরক্ষনাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। গোরক্ষপুরের গোরক্ষমন্দিরে সুসজ্জিত গদির উপর গোরক্ষচরণ রক্ষিত হইয়াছে ও তাহার নিত্যপূজার ব্যবস্থা রহিয়াছে। গোরক্ষপ্রজ্বলিত একটি প্রদীপ অদ্যাপি মন্দির-মধ্যে জ্বলিতেছে। এইস্থানের মঠ স্বয়ং গোরক্ষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। বালকবালিকাদের নষ্টস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত এইস্থানের মোহন্তদের পূজা বিশেষ ফলপ্রদ হয় বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। শ্রীগোরক্ষনাথের আধ্যাত্মিক শিষ্য বাবা গম্ভীরনাথের বহু বিশিষ্ট বাঙালি শিষ্য এইস্থানে তাঁহার মর্মর মূর্তি স্থাপিত করিয়াছেন দেখিলাম। মন্দিরটি শ্বেতপ্রস্তরে নির্মিত এবং ক্ষুদ্র হইলেও

বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। গম্ভীরনাথজী যেমন সুপুরুষ ছিলেন, তাঁহার চরিত্রবলও সেইরূপ অসাধারণ ছিল। দানশীলতার জন্যও তিনি খ্যাত ছিলেন। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তাঁহার 'আশাবতীর উপাখ্যানে' বাবাজীর নাম না দিলেও তাঁহারই গুণকীর্তন করিয়াছেন। গোরক্ষপুরের মঠাধ্যক্ষরূপে ইনি জনসাধারণের ভক্তিঅর্ঘ্য পাইয়াছেন। শান্তিনাথ ও নিবৃত্তিনাথ নামে তাঁহার বাঙালি শিষ্য ও সন্ন্যাসীদ্বয় এখনও গোরক্ষপুরে আছেন।

কাশীতে গোরক্ষ-টিলা নামে যে স্থান আছে, তাহার অবস্থা শোচনীয়। টিলার মূর্তি পুঁথি সবই অপহৃত হইয়া নগ্নমূর্তি প্রস্তরমন্দির এখনও কোনো প্রকারে দাঁড়াইয়া আছে, পূজারী একটি মূক-বধির নেপালী।

পেশোয়ার লাহোর অমৃতসহর অম্বালা রোটাস কিরানা প্রভৃতি স্থানও যোগীদের প্রভাবমুক্ত নহে। কাথিওয়াড় রাজপুতানা নাথযোগীদের বাসস্থানরূপে এখনও প্রসিদ্ধ।

কথিত আছে, কাথিওয়াড়ের পাহাড় গোরক্ষের প্রিয় আবাসস্থল ছিল। উড়িষ্যাপ্রদেশের পুরীতে কানফাটাদের সৎনাথী নামক সম্প্রদায়ের মঠ ও মন্দির আছে। আমেদাবাদের উত্তরে গোরক্ষনাথের নামে পর্বতশ্রেণী আছে।

বঙ্গদেশে দমদমের নিকট গোরক্ষবাঁশলী নামে গোরক্ষক্ষেত্রের নাম অনেকেই অবগত আছেন। এখানকার মন্দির-মধ্যে গোরক্ষনাথ মৎস্যেন্দ্রনাথ ও দত্তাত্রেয়ের মূর্তি আছে। গোরক্ষের পূর্বে কপিলমুনি এস্থানে সাধনা করেন এইরূপ প্রবাদ থাকায় কপিলমুনিরও ক্ষুদ্র শ্বেতপ্রস্তরের মূর্তি এখানে আছে। শিব ভৈরব হনুমান কালী মনসা প্রভৃতিও বাদ যান নাই। মেদিনীপুরের সিদ্ধকুণ্ডে ও হুগলী জিলার পাণ্ডুয়ার নিকটবর্তী মহানাদ নামক গ্রামে মহাদেব জটেশ্বরের মন্দির আছে, ইহারাও গোরক্ষক্ষেত্র। সম্প্রতি নাথ-সম্প্রদায়ের কয়েকটি

উৎসাহী যুবক এইস্থান অধিকার করিয়া গোরক্ষমন্দির প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় আছেন। বেলগাছিয়াতে যোগাচার্য গোরক্ষপরিষদ নামে ইহাঁদের একটি প্রতিষ্ঠান আছে।

আচার-সংস্কারাদি ও বেশভূষা

নাথযোগীরা কর্ণের উপাস্থি ভেদ করিয়া ধাতু বা গণ্ডারের শৃঙ্গ নির্মিত কুণ্ডল ধারণ করিয়া অপরাপর যোগী হইতে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেন। কর্ণভেদ দ্বারা যোগজ সিদ্ধিলাভ হয় ও পরমাত্মা দর্শন হয় বলিয়া কুণ্ডলের অপর নাম দর্শনী। কানফাটা যোগীরা কর্ণের কোমল নিম্নভাগ ছেদন করেন এবং ইঁহারা গোরক্ষনাথকে নাথপন্থের প্রতিষ্ঠাতা রূপে স্বীকার করেন না। গোরক্ষনাথীদের নিকট গোরক্ষই প্রতিষ্ঠাতা ও উপাস্য রূপে সম্মানিত। উৎসবাদিতে কানফাটা যোগী হইতে গোরক্ষনাথীদের স্থান উচ্চতর।

কুণ্ডল ব্যতীত হস্তে পিত্তলাদির বলয়, গলায় হিংলাজ ও আশাপুরী নামক মালা এবং রুদ্রাক্ষের মালা ধারণ রীতি আছে। ইহা ব্যতীত গলায় সেলী নামক ঔর্ণ উপবীতে শিংনাদ নামে দুই-তিন অঙ্গুলি পরিমাণ কৃষ্ণবর্ণ শিংএর বংশী ধারণ রীতি আছে। এই শিংনাদ পবিত্রী নামক বলায়াকার দ্রব্য হইতে লম্বিত হয়। এই শিংনাদ ও পবিত্রী জগৎ কারণের প্রতীক রূপে যোগীরা ধারণ করেন।

গৈরিক বা শ্বেত বস্ত্র ধারণ, জটাধারণ বা মুণ্ডিতমস্তক হওয়া এবং ললাটে ত্রিপুণ্ড্র ধারণ নাথযোগীদের মধ্যে প্রচলিত। সাধনের নিমিত্ত ধুনি ও চিবুকভার ন্যস্ত করিবার জন্য আচল নামে খঞ্জ যষ্টি ব্যবহৃত হয়।

দণ্ড ও শিখা ধারণ ইঁহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। পাণ্ডবেরা মৃত আত্মীয়ের পিণ্ডদান সময়ে গণ্ডারচর্ম-নির্মিত পাত্রে জলদান করেন,

তাই গণ্ডারের চর্মকে ইহারা পবিত্র মনে করেন। এই চর্মের দ্বারা নির্মিত কুণ্ডল অপহৃত হইলে সে যোগীর পক্ষে মুখপ্রদর্শন নিষিদ্ধ, এমন কি তাহাকে জীবন্ত সমাধি দিবার রীতি প্রচলিত ছিল। দর্শন কোনো প্রকারে ভাঙিয়া গেলে অন্যের সহিত বাক্যালাপ বন্ধ রাখার নির্দেশ আছে।

যোগীদের মধ্যে জাতিভেদ নাই, কিন্তু শ্রেণীভেদ আছে। খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। মাংস আহার নিষিদ্ধ না হইলেও মৎস্য হইতে মৎস্যেন্দ্রনাথ জাত বলিয়া মৎস্য আহার নিষিদ্ধ। শ্বাসপ্রশ্বাসের সংখ্যাদি হইতে শুভাশুভ ফল নির্ণয়, কবচ ও ঔষধাদি বিতরণ ইহাদের মধ্যে দেখা যায়। শিবরাত্রিতে ও নাগপঞ্চমীতে যোগীদের বিশেষ উৎসব হয়। অন্ন-বিতরণ নাথপন্থীদের গৌরবের বিষয়। নাথযোগীদের ইষ্টমন্ত্র শিব-গোরক্ষ, ইঁহাদের দীক্ষাকাল পৌষ হইতে চৈত্র মাস পর্যন্ত প্রশস্ত। কোনো যোগীর মৃত্যু হইলে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়, তৎপূর্বে হিন্দুত্বের বৈশিষ্ট্য স্বরূপ মুখাগ্নি করার প্রথা আছে। মুসলমানেরাও যোগীদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতেন। একত্রে আহারাদি না করিলেও নাগপঞ্চমীর দিন হিন্দু ও মুসলমান যোগীরা একত্রে 'গুগা' গীত গাহিয়া ভিক্ষা করেন, গুগা বাসুকির জামাতা ছিলেন। শিবরাত্রিতে গোরক্ষগীত গাওয়া হয়। নেপালে মৎস্যেন্দ্রের রথযাত্রা আমাদের দেশের জগন্নাথের রথযাত্রার মত মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যচ্যুত নেপালরাজ শ্রীবসন্তদেবজী মৎস্যেন্দ্রের আশীর্বাদে স্বীয় রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইলে প্রতি বৈশাখ মাসে ভোগমতী নদীতীরে তাঁহার উৎসবের ব্যবস্থা করেন। নাথযোগীরা পরস্পরকে 'আদেশ' শব্দ দ্বারা অভিবাদন করেন, ইহা 'আদীশ' শব্দের অশুদ্ধরূপ, ইহার অর্থ 'তুমি ব্রহ্মস্বরূপ'। অনুজ্ঞা সূচক 'আদেশ' শব্দের সহিত ইহার যোগ নাই।

সিদ্ধান্ত ও সাধনা

শ্রীমৎস্যেন্দ্রনাথ অবলোকিতেশ্বরের অবতার রূপে নেপালে অদ্যাপি পূজা পাইয়া আসিতেছেন বলিয়া নাথযোগীদের বৌদ্ধ বলিয়া কেহ কেহ মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। প্রবাদ আছে, গোরক্ষও বৌদ্ধ ছিলেন, তাঁহার পূর্ব নাম রমনবজ্র বা অনঙ্গবজ্র ছিল, স্বধর্ম ত্যাগ করায় নেপালী বৌদ্ধেরা তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট। তথাপি শৈবপন্থী মৎস্যেন্দ্রের নেপালের প্রধান দেবতারূপে অর্চিত হওয়া বাস্তবিক বিস্ময়জনক। নেপালে শৈবযোগীর বেশে মৎস্যেন্দ্র শৈবধর্মই প্রচার করেন, তাঁহার মন্ত্র ও তীর্থাদিও শৈব, শৈবযোগীরাই প্রথমে সহজবোধ্য সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় পদ রচনা করেন, তাহাও নিঃসন্দেহ। অতএব মৎস্যেন্দ্র কোনোক্রমে বৌদ্ধ হইতে পারেন না। তবে পূর্ববর্তী ধর্মসম্প্রদায়ের কিছু প্রভাব পরবর্তী ধর্মসম্প্রদায়ের উপর বিস্তারিত হওয়া বিচিত্র নহে। নাথযোগীদের আচার-অনুষ্ঠান মিশ্রিত হওয়ায় এই ভ্রান্ত ধারণা আরও প্রচলিত হইয়াছে, যথা, বৌদ্ধদের ন্যায় জাতিভেদ না থাকা, মস্তকমুণ্ডন করা, ভোটিয়া গ্রন্থে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের তালিকা মধ্যে ও বংশবৃক্ষ মধ্যেও নাথসিদ্ধদের নাম থাকা ইত্যাদি। বৌদ্ধদের প্রজ্ঞা ও উপায়, নাথদের শিব ও শক্তি সম্বন্ধে একই প্রকার ধারণা দেখা যায়। বৌদ্ধদের করুণা ও শূন্যতার মিলনে 'মহাসুখ' অনুভূত হয়, নাথদের শিব ও শক্তির মিলনে 'সামরস্যের' উদ্ভব হয়। বৌদ্ধ সহজিয়া রহস্যবাদের সহিত হিন্দুতন্ত্রের অপূর্ব মিলন নাথপন্থে দেখা যায়। বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনায় চন্দ্রসূর্যের বারংবার উল্লেখ দেখা যায়, আমাদের নাথসিদ্ধ হাড়িপাও চন্দ্রসূর্যকে কুণ্ডলরূপে ধারণ করিয়া থাকিতেন। চন্দ্রসূর্যের মিলন দ্বারা আনন্দানুভূতি অর্জন উদ্দেশ্য হইলেও বৌদ্ধ সহজিয়ারা সান্ধ্য অর্থাৎ অভিসন্ধিত ভাষা-দ্বারা সে সাধন গুপ্তই রাখিয়াছেন।

বৌদ্ধতন্ত্রে দশসিদ্ধি, অষ্টাদশ সিদ্ধি প্রভৃতি নানাপ্রকার সিদ্ধির কথা আছে। গোরক্ষের বায়ুপথে গমনও একটি বিশেষ সিদ্ধি, গোপীচন্দ্রের গানে পাই—

হেনকালে পূর্ব্বেত গোর্খ পশ্চিমেতে যাএ।
বার বচ্ছর ধরি গোর্খ শূন্যেতে ভ্রমএ।।

গোরক্ষবিজয় গ্রন্থে পাই—

এ বলিয়া জতিনাথ আসন করিল।
লঙ্গ মোহালঙ্গ দুই সংহতি লইল।।
আসন করিয়া নাথ শূন্যে কৈল ভর।
সাচন উড়এ জেন গগন উপর।।···
আড়ে আড়ে চাহে নাথ শূন্যে ভর করি।

গোরক্ষনাথ শূন্যে ভর করিয়া সাচন অর্থাৎ বাজপক্ষীর ন্যায় দেশ হইতে দেশান্তরে গমন করিতে লাগিলেন। ইহাও তাঁহার বিভূতি বা সিদ্ধি।

বৌদ্ধ সহজিয়ারা উত্তরসাধিকা লইয়া সাধন করিতেন। নাথমার্গে বজ্রোলী সহজোলী প্রভৃতি মুদ্রার সাধন থাকিলেও শক্তি লইয়া সাধনের কোনো স্পষ্ট ইঙ্গিত পাই না। কদলীরাজ্যে মৎস্যেন্দ্রের পতন সুবিদিত হইলেও গোরক্ষনাথকে মহাদেবীও তাঁহার ছলনায় মুগ্ধ করিতে পারেন নাই, পক্ষান্তরে গোরক্ষনাথ স্বীয় স্ত্রীকে মাতৃসম্বোধন করিতেছেন তাহাও দেখিতে পাই। বিবাহরাত্রে স্বীয় জ্ঞানবলে গোরক্ষনাথ

ছয়মাসের শিশু হইল মন্দির ভিতর।।
দুগ্ধ খাইবার চাহে কান্দে ওয়া ওয়া।
তা দেখিয়া রাজ-কৈন্যা হইল আচাভুয়া।[৫]

গোরক্ষনাথের অতুলনীয় সংযম দ্বারা ভূষিত চরিত্রই সম্ভবত গুরু মৎস্যেন্দ্র অপেক্ষা শিষ্যের অধিক প্রভাবের কারণ। তথাপি মৎস্যেন্দ্র প্রিয় শিষ্যকে ত্যাগ ও ভোগের রহস্য শিক্ষা দিবার জন্য স্বেচ্ছায় এই

৫ গোরক্ষবিজয়, পৃ ৩৫-৩৬

পতনের অভিনয় করিয়া শিষ্যকে বিভ্রান্ত করেন, এরূপ মতামত প্রচলিত আছে। নাথযোগীদের আদর্শ 'ত্যাগ' ও 'ভোগে'র সামঞ্জস্য। নাথ-লক্ষণ এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—

> একহস্তে ধৃতস্ত্যাগো ভোগশ্চৈককরে স্বয়ম্।
> অলিপ্ত স্ত্যাগভোগাভ্যাম্ ॥৬

অর্থাৎ যাঁহার এক হস্তে ত্যাগ অপর হস্তে ভোগ ধৃত এবং ভোগ ও ত্যাগের দ্বারা যিনি অলিপ্ত, তিনিই নাথস্বরূপ।

মহাসিদ্ধেরা গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করেন না; তাঁহারা অবধূত, জ্ঞানই তাঁহাদের দণ্ড, তন্ময়তা যোগরূপ সূত্রই তাঁহাদের উপবীত, পরমাত্মায় স্থিতিই তাঁহাদের সন্ধ্যা। এই পরমাত্মা দ্বৈতাদ্বৈতের সগুণনির্গুণের অতীত, তিনি বিশ্বোত্তীর্ণ ও নাথস্বরূপ। নিজের সহিত এই পরমাত্মার একতা উপলব্ধিই নাথপন্থের আদর্শ। শাস্ত্রপাঠদ্বারা কেবল জ্ঞানার্জন বা অনুপযুক্ত বহু শিষ্যগ্রহণ নাথগুরুর আদর্শ নহে। মহাজ্ঞান অর্থাৎ যোগযুক্ত জ্ঞান লাভ করিয়া কায়াসাধন দ্বারা অজর-অমরত্ব প্রাপ্তি নাথগণের প্রেয়।

গোরক্ষ-রচিত অমরৌঘশাসনে মোক্ষ সম্বন্ধে যে আদর্শ আছে তাহাও সিদ্ধযোগীর বৈশিষ্ট্য। গোরক্ষ বলিয়াছেন, শব্দব্রহ্মের পারদর্শিতা হইতে পরব্রহ্মের জ্ঞান হয়, অতএব 'সর্বং পরিত্যজ্য শব্দব্রহ্ম সদাভ্যসেৎ', বায়ুকে আশ্রয় করিয়াই এই শব্দহীন নাদের উৎপত্তি হয়। শব্দ-চৈতন্যের দ্বারা দেহস্থ সুপ্তা কুণ্ডলিনী জাগরিতা হইয়া ষট্চক্র ভেদ করিয়া মস্তকস্থিত সহস্রারচক্রে শিবস্থানে মিলিত হইলে যোগীর যে দৈহিক নিশ্চল অবস্থা প্রাপ্তি হয় ও তিনি যে মিলনানন্দ অনুভব করেন, নাথ-মতে তাহাই মহাসুখ। এই অনির্বচনীয় অবস্থা লাভেই সাধক উন্মুখ হইয়া থাকেন। তৎপরে সেই আত্মসাক্ষাৎ লাভ মূলক দেহকে যোগী অজর অমর করিয়া রাখিবার জন্য 'খেচরী'-মুদ্রার সাধন করেন,

৬ গোরক্ষসিদ্ধান্ত-সংগ্রহ, পৃ ১

ইহার ফলে যোগীর সর্বপ্রকার বৃত্তির নিরোধ হয় এবং মৃত্যুভয় থাকে না। খেচরীমুদ্রার সাধনফলে জ্ঞানপূর্বক চন্দ্রামৃত গ্রহণ করিয়া যোগী কালজয়ী হন, কিন্তু সাংসারিক অজ্ঞানী মানব এই অমৃতকে গ্রহণ না করিয়া নষ্ট করিয়া ফেলেন।

নাথপন্থের গ্রন্থে আছে—

অজরামর পিণ্ডো যো জীবন্মুক্তঃ স এব হি। [৭]

অর্থাৎ যাহার পিণ্ড বা দেহ অজর অমর, সেই জীবন্মুক্ত। জীবন্মুক্ত যোগী অর্থে পার্থিব দেহপাতের পূর্বেই যাহার মুক্তি হইয়াছে, এইরূপ যোগী। তিনি জীবিত থাকিয়া মুক্ত, অর্থাৎ কর্মফল দ্বারা আবদ্ধ নহেন। পার্থিব ও তৎপরে সূক্ষ্ম দেহ নাশের পর যে মুক্তি লাভ হয়, তাহা বিদেহ মুক্তি নামে পরিচিত। জীবন্মুক্ত যোগীর প্রারব্ধ কর্মের ফলেই স্থূল দেহ থাকে, তিনি যতদিন ইচ্ছা এই দেহ ধারণ করিয়া থাকেন, কিন্তু পদ্মপত্রে জলের ন্যায় নিরাসক্ত হইয়া সংসারে বিরাজ করেন। দেহশুদ্ধ হইলেই জীবন্মুক্তি হয়, জীবন্মুক্ত যোগী একদিকে বিশ্বের সহিত যুক্ত হইয়াও বিশ্বাতীতের সহিত সংযুক্ত, এইরূপে তিনি বিদেহ-মুক্তির প্রতীক্ষায় থাকেন। জীবন্মুক্তির নিমিত্ত শাস্ত্রজ্ঞান প্রতিবন্ধকস্বরূপ, যোগাভ্যাসের দ্বারা শিব ও শক্তির অবিমিশ্র সত্তার অনুভবই এইরূপ মোক্ষলাভের উপায়। জীব ও শিবের অভিন্নত্বই জীবের আদি অবস্থা, সংসারচক্রে আবদ্ধ হইয়া মানব সে কথা ভুলিয়া যায়, তাই সংসারী মানবের পক্ষে সদ্‌গুরুর প্রয়োজনীয়তা আছে।

গুরুতত্ত্ব

নাথপন্থের মতে সদ্‌গুরুই সেই দ্বৈতাদ্বৈতবিলক্ষণ পরমপদের প্রাপ্তির উপায় বলিয়া দিতে সক্ষম—

৭ যোগবীজ, ১৭১ শ্লোক

তেন সন্দির্শতেন মার্গে প্রাপ্যতে পরম পদম্।

দাদূও বলিয়াছেন

দাদূ এসা গুরু মিল্যা, জীব ব্রহ্ম করি লেই।

সদ্গুরু পক্ষপাতবিনির্মুক্ত, বর্ণাশ্রমাতীত, গুণাভিমান-রহিত ও সকল গুরুর গুরু, তাঁহার বচনে বচনে বেদ, পদে পদে তীর্থ। তিনি মৌন ব্যাখ্যা দ্বারাই শিষ্যকে উপদেশ দেন। শিষ্যগ্রহণের পূর্বেই গুরু তাহার যোগ্যতা বিচার করিয়া লন। শিষ্যের পক্ষেও একমাত্র গুরু-কৃপাতেই সিদ্ধিলাভ সম্ভব—

সিদ্ধিগুর্রুবাক্যেন লভ্যতে।

নাথযোগীরা শিব সদৃশ হইবার নিমিত্ত যে সাধন করেন তাহা সহজাবস্থা লাভ বলিয়া বর্ণিত হয়। তাই ইহাঁরা বলিয়াছেন—

দুর্ল্লভা সহজাবস্থা সদ্গুরোঃ করুণাং বিনা।

এইরূপে পদে পদে তাঁহারা সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণের জন্য উপদেশ দিয়াছেন, এই ভবসমুদ্র পার হইবার একমাত্র কাণ্ডারী হইলেন সদ্গুরু। শিবশক্তির পার্থক্য পরিহার করিয়া সেই তত্ত্বাতীত, অবর্ণনীয়, 'যাদৃশ এব তাদৃশ এব' নাথস্বরূপে আত্মসমর্পণ ব্যতীত অন্য গতি নাথপন্থে নাই। সদ্গুরুই সেই নাথস্বরূপকে অধিগম্য করাইতে সক্ষম।

পিণ্ডতত্ত্ব ও দেহতত্ত্ব

নাথগণ বলেন, নানা স্থূল ও সূক্ষ্ম আবরণে জীব আবৃত হইয়া সেই পরম সত্য 'পরম পদ' হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, এইসমস্ত আবরণ শক্তির নানারূপ, ইহাই জীবে ও শিবে ভেদের কারণস্বরূপ। জীব স্বচেষ্টায় সেইসকল শক্তির পরিশুদ্ধি ও আবরণ অপসারণ করিয়া স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। এইরূপে জীব মুক্তিলাভ করে। এই মুক্তি সাধনসাধ্য। তাই নাথগণ জীবের স্বরূপ কি, কোথা হইতে জীবের উৎপত্তি হইল,

এইসকল কথা আলোচনা প্রসঙ্গে সেই বিশ্বোত্তীর্ণ পরম সাম্য অবস্থা হইতে যে গর্ভ পিণ্ডে ভ্রূণরূপে জীবের স্থূলরূপে আবির্ভাব হয় সে পর্যন্ত ষট্‌পিণ্ডের আবির্ভাব কল্পনা করিয়াছেন। ইহাই পিণ্ডতত্ত্ব বিচার। পিণ্ড অর্থে সৃষ্ট পদার্থ, জীবদেহ এই নিমিত্ত 'পিণ্ড' নামে অভিহিত হয়। এইরূপে নিরাকার হইতে সাকার, সূক্ষ্ম হইতে স্থূল ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের সর্বাকাররূপে স্ফুরিত হইয়াও পরম শিব নিত্যকাল আপন পূর্ণরূপেই অবশিষ্ট থাকেন।

আবার নাথগণ বলেন, পিণ্ড বা দেহের সহিত ব্রহ্মাণ্ডের কি সম্বন্ধ তাহাও জানা কর্তব্য, কারণ 'যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে তা আছে এ দেহভাণ্ডে' অর্থাৎ এ ক্ষুদ্র দেহরূপ ভাণ্ডে যাহা কিছু আছে তাহা ব্রহ্মাণ্ডেরই প্রতীক, তাহার অধিক এ দেহে কিছু নাই। ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যে শক্তি আছে মানবদেহে তাহাই কুণ্ডলিনীরূপে বিরাজিত। জীবমধ্যে এই শক্তির বিকাশের জন্যই যোগসাধনের আবশ্যকতা আছে। এই শক্তি দ্বারাই মানব 'পরমপদে'র সন্ধান পায়। ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন স্তরের সহিত মানব-দেহাশ্রিত বিভিন্ন চক্রের সম্বন্ধ নির্ণীত হইয়াছে। ইহার শেষ চক্র সহস্রদল মণ্ডলে যোগ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে সাধকের শত্রু-মিত্র বিষ্ঠা-চন্দনে ভেদাভেদ থাকে না, তখন তিনি স্বয়ং পূর্ণ-স্বরূপ কুলাচারী হন বলিয়া 'কৌল' নামে অভিহিত হন। এই অবস্থায় বুদ্ধিকৃত কর্মসকল লুপ্ত হইয়া যায় এবং যোগী কুলের অর্থাৎ ব্রহ্মশক্তির ক্রীড়াপুত্তলিকা হইয়া বিচরণ করেন। শ্রীমৎস্যেন্দ্রনাথ স্বীয় পুঁথির ভনিতায় নিজেকে কৌল বলিয়াছেন।

নাথগণ দেহ মধ্যে চক্রের ধ্যানদ্বারা পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের ব স্থূল ও সূক্ষ্মের সম্বন্ধ স্থাপন করিতেন সন্দেহ নাই। এ যুগে এসকল কথা অস্বাভাবিক মনে হইলেও প্রাচীনকালে সন্তসম্প্রদায় মধ্যে, এমন কি

পাশ্চাত্যদেশের রহস্যবাদীদের মধ্যেও, পিণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডের কল্পনা প্রচলিত ছিল।

শিব শক্তি ও জীব কল্পনা

শিবই জীব, জীবই শিব, ইহা প্রচলিত কথা। পূর্বে বলা হইয়াছে, পিণ্ডসমূহ স্থষ্ট পদার্থ, অতএব স্থষ্টির মধ্যে ক্রিয়া আছে স্বীকার করিতেই হয়। আবার কার্য থাকিলে তাহার কারণ থাকিবে। স্থষ্টিরূপা শক্তির কারণ হইলেন অনন্ত শক্তিমান শিব। এই শিব ও শক্তি, চন্দ্র ও চন্দ্রিকার ন্যায় এক এবং অভিন্ন। শক্তির প্রসরেই স্থষ্টি, সংকোচনে সংহার। নাথপন্থের পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের সংযোগ দ্বারা জীব যে শিবত্ব লাভের প্রয়াস করেন, তাহা কিরূপে সম্ভব? সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলা যায় যে, নাদরূপিণী শক্তি মানবের মূলাধারে জড়তাপ্রাপ্ত হইয়া সুপ্তা আছেন, তাঁহাকে জড়তামুক্ত করিয়া শরীরস্থ মধ্যনাড়ী স্থষুম্নার পথে চালিত করিতে হয়, তখন এই পথেই মন 'শূন্যে' নীত হয় এবং শিবত্বলাভ হয়। এই শূন্যের ধারণা বৌদ্ধধর্ম হইতে প্রবেশ করিয়াছে, কেহ কেহ এইরূপ অনুমান করিলেও উহা অযথার্থ। কারণ ঋগ্বেদের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ধর্মে কোনো-না-কোনো প্রকার 'শূন্যে'র উল্লেখ দেখা যায়। বিস্তারিত বিবরণ এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক।[৮] তবে নাথপন্থের শ্বাসপ্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণে স্থষুম্না-দ্বার মুক্ত হইয়া গেলে যোগী 'শূন্যময়' অবস্থা প্রাপ্ত হন, তখন তত্ত্বসকল তাঁহার নিকট প্রকাশিত হয়। বিশুদ্ধ শূন্যই 'নির্বাণপদ', ইহা বাসনাকামনাহীন কর্মাশয়হীন তত্ত্বাতীত অবস্থা। পারমার্থিক অবস্থাই 'শূন্য' নামে পরিচিত। শিব ও শক্তির পার্থক্য পরিহার করিতে পারিলে সাধক এই অবস্থায় পৌঁছাইতে সক্ষম হন—

লেখিকা রচিত 'নাথসম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধনপ্রণালী' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য

শিবস্যাভ্যন্তরে শক্তিঃ শক্তেরভ্যন্তরে শিবঃ।
অন্তরং নৈব পশ্যামি চন্দ্র-চন্দ্রিকয়োরিব ॥[৯]

একমাত্র শক্তির সাহায্যেই এই পারমার্থিক তত্ত্বাতীত অবস্থায় পৌঁছানো সম্ভব।

শব্দযোগ বা বাক্‌যোগ এই সাধনের একমাত্র সহায়। উপনিষদাদিতে যে একাক্ষর নাম স্মরণ দ্বারা ব্রহ্মলাভ হয় বলা হইয়াছে, প্রাক্তন নাথপন্থেও তাহার বিশেষ সাধন ছিল। প্রাচীন আগমশাস্ত্রে এই একাক্ষর ওংকার সাধনকেই বাক্‌যোগ বলিত, আধুনিক জগতে শব্দবিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধিত হইলেও শব্দব্রহ্মের তাৎপর্য ক্রমশ অজ্ঞাত হইয়া পড়িতেছে। এই বিশেষ সাধনই নাথমার্গে নাদবিন্দু-সাধনের প্রক্রিয়ারূপে বর্ণিত হইয়াছে, ইহা দ্বারাই শিবত্বপ্রাপ্তি হয়। নাদ ও বিন্দু বস্তুত একই পদার্থ, ব্যক্ত অবস্থায় যাহা নাদ, অব্যক্ত অবস্থায় তাহাই বিন্দু। পরব্রহ্মে ও শব্দব্রহ্মে বস্তুত কোনো ভেদ নাই। পরমেশ্বরের প্রথম বিকাশ নাদ ও বিন্দুতে, সেই নিমিত্ত সাধকের পরমপদ সাক্ষাৎকালে শুদ্ধ জ্যোতি ও নাদধ্বনির উপলব্ধি হয়। শব্দব্রহ্ম জ্ঞানই শ্রুতবিদ্যা, তথাপি তপস্যা ব্যতীত উহা অধিগত হয় না। গোপীচন্দ্রের মাতাও স্বীয় তপস্যা বলে গোর্খনাথ হইতে প্রাপ্ত মন্ত্রসাধন করিয়া মহাজ্ঞানের অধিকারিণী হন, মরণোন্মুখ স্বামীকে জীবন দান করিবার জন্য তিনি বলিলেন—

কিছু জ্ঞান কহি দিমু আড়াই অক্ষর।
পৃথিবী টলিলে না জাইবে জমঘর ॥[১০]

কিন্তু স্ত্রীর নিকট মন্ত্র লইতে রাজা অসম্মত হইলেন, কারণ ইহা অশাস্ত্রীয়।

৯ সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ ৪।৩৭ শ্লোক। সরস্বতী ভবন, কাশী। পৃ ২০, ২৭

১০ গোপীচন্দ্রের পাঁচালী, পৃ ৩৪৭। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত

ফলে যমদূত রাজাকে লইয়া গেল। আমাদের মতে এই 'আড়াই অক্ষর জ্ঞান' ওংকার সাধনেরই ইঙ্গিত।

উল্টাসাধন ও কায়াসাধন

শব্দযোগ সাহায্যে অধোমুখী শক্তিকে যোগী উর্দ্ধমুখী করেন, এই সাধনই 'উল্টাসাধন' নামে পরিচিত। কারণ সংসারী লোকে এই পথে গমন করে না, ইহা উল্টা পথ। পূর্বে বলা হইয়াছে 'কায়াসাধন' দ্বারা যোগী অজর অমর হইতে প্রয়াস করেন, এই কায়াসাধন অর্থে দেহদ্বারা সাধন এবং এই সাধনের পক্ষে উল্টাসাধন অপরিহার্য। গোরক্ষনাথাদি মহাযোগীরা এই সাধনবলেই পিণ্ড স্থৈর্য লাভ করেন। তদুপরি তাঁহারা ছিলেন অবধূত, অর্থাৎ চতুরাশ্রমের অতীত যিনি পঞ্চমাশ্রমী, তিনি সর্বাবস্থা বিনির্মুক্ত, অতএব নাথ-মতে তিনিই যথার্থ মতে শিবকে জানিবার অধিকারী বা অবধূত।

বঙ্গসাহিত্যে প্রভাব

নাথসম্প্রদায়ের বহু পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে যোগবীজ, অমনস্ক, গোরক্ষসিদ্ধান্ত-সংগ্রহ, সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ, সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত পদ্ধতি, বিবেক মার্তণ্ড প্রভৃতি তাঁহাদের দর্শন ও সাধন বুঝিবার উপযোগী গ্রন্থাদি সংস্কৃতে রচিত ; গোরক্ষবোধ, গোরক্ষনাথজীকা পদ, গোরক্ষগোষ্ঠী, আত্মবোধ, গোরক্ষ-উপনিষদ প্রভৃতি হিন্দীতে রচিত। যোধপুররাজ মানসিংহ গোরক্ষ-রচিত গ্রন্থাদি সংগ্রহ করেন। গোরক্ষের নামে সপ্তবিংশ গ্রন্থ প্রচলিত আছে। হরিদ্বার মাদ্রাজ কাশী প্রভৃতি স্থানে নাথসিদ্ধদের রচিত বহুপদ ও পুঁথি এখনও পাওয়া যায়। অনুসন্ধান করিয়া কিছু পদ ও পুঁথি আমি পাইয়াছি।

এক্ষণে বঙ্গভাষায় রচিত মীননাথ গোরক্ষনাথ ময়নামতী ও গোপীচাঁদ সম্বন্ধে পুঁথির আলোচনা করিব। বঙ্গভাষায় রচিত পুঁথিগুলি বহু প্রাচীন নহে, অধিকাংশই অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত গোরক্ষবিজয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত গোপীচন্দ্রের পাঁচালী, গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস, ঢাকা-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত গোপীচন্দ্রের গীত ও ময়নামতীর গান, গ্রীয়ারসন্ কর্তৃক রংপুর হইতে সংগৃহীত মানিকচন্দ্রের গান প্রভৃতির কথা সুধীসমাজের অজ্ঞাত নহে। সুদূর নেপালেও গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস-বিষয়ক বাংলা নাটক পাওয়া গিয়াছে; পুঁথিটি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সযত্নে রক্ষিত আছে। বঙ্গদেশে বিশেষত পূর্বাঞ্চলে এখনও নাথযোগীদের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হয় নাই, গোপীযন্ত্রের সাহায্যে নাথগীতিকা গাওয়া এখনও প্রচলিত আছে। গোরক্ষের যোগপ্রভাবেই ইহা সম্ভব হইয়াছে। এক্ষণে বঙ্গসাহিত্যে গোরক্ষের যোগপরিচয় সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

গোরক্ষবিজয় গ্রন্থে দেবী মহাদেবকে প্রশ্ন করিতেছেন : আমি যতবারই জন্মাই ততবারই মরি, তুমি অমর, ইহার কারণ কি? দেবীর প্রশ্নের উত্তরে শিব তাঁহাকে ক্ষীরোদসাগর কূলে অজর অমর হইবার পরমতত্ত্ব শুনাইলেন, কিন্তু সেই মহাজ্ঞান লাভ করিলেন মৎস্যেন্দ্র। এই মহাজ্ঞান দ্বারাই মরণশীল দেহের পরিবর্তন সাধিত হয়, এই সাধনই কায়াসাধন, ইহার ফলেই যোগীর শুদ্ধ বা পক্বদেহ লাভ হয়— তাহাই 'শিবতনু' নামে খ্যাত। পক্বদেহে জরামরণ প্রভৃতি বিকার থাকে না, অপক্বদেহে থাকে— তাহাই সংসারী মানবের দেহ।

এই গ্রন্থের অন্যান্য স্থানেও পাই গোরক্ষ গুরুকে বলিতেছেন— কায়া সাধ, কায়া সাধ। আবার অন্যত্র গুরুকে উলটিয়া যোগ ধর বলিতেছেন। ইহাও উল্টাসাধনের ইঙ্গিত। এই যোগফলে 'মহারস'

উর্ধ্বে নীত হইলে আয়ুবৃদ্ধি হয়। এই কায়াসাধনের বঙ্কনাল বা শঙ্খিনী নাড়ী সহায়, তাই বলিতেছেন—

সরুয়া সংখিনী সহ একা ভেদি কাল।
বেঙ্কানালে সাধগুরু না করিও হেলা॥

ইত্যাদি। ষট্‌চক্র সাধনের কথাও ইহাতে আছে। শরীরের বিভিন্ন নাড়ী, অজপা জপ প্রভৃতিরও উল্লেখ আছে। ইহার অনুরূপ কথা নাথ-হিন্দী-সাহিত্যে প্রচুর আছে।

গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসে অজপা জপের মাহাত্ম্য-বর্ণনা আছে। অজপা অর্থে যাহা স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাসের দ্বারা সাধ্য, ইহাই হংস বা সোহং মন্ত্র। এই সাধন দ্বারা অমর হওয়া যায়। যোগসাধনে মহারস রক্ষা করা অবশ্যকর্তব্য, তাই ময়নামতী পুত্রকে সেই সহস্র কৌটা রত্নসম মহারস রক্ষা করিতে বলিতেছেন।[১১]

গোপীচন্দ্রের পাঁচালীতে মাতার প্রতি সন্দিগ্ধমনা পুত্রের অদ্ভুত পরীক্ষাসকলের কথা এবং মাতাপুত্রের তত্ত্বালোচনা আছে। পুত্র মাতাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন

কোন বিরিখের বোঁটা আমি মা কোন বিরিখের ফল

মাতা উত্তরে বলিতেছেন—

মন বিরিখের বোটা তুই তনু বিরিখের ফল॥
গাছের নাম মনুহর, ফলের নাম রসিয়া।
গাছের ফল গাছে থাকে, বোটা পড়ে খসিয়া॥
কাটিলে বাচে গাছ না কাটিলে মরে।
দুই বিরিখের একটি ফল জাননি সে ধরে॥

তৎপরে সেই শরীর মধ্যে গঙ্গা বারাণসী প্রভৃতির অবস্থা বর্ণন ইত্যাদি পূর্বে উল্লিখিত পিণ্ডতত্ত্বেরই আলোচনা আছে, রসগ্রাহীই সে রস

১১ গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস, পৃ ৪৩৮

আস্বাদন করেন। সৃষ্টি ও সংহার এবং পিণ্ড উৎপত্তি বিচার কথাও গোরক্ষবিজয় ও শূন্যপুরাণ নামে ধর্মপূজার পদ্ধতি মধ্যে আলোচিত হইয়াছে। প্রভুর তুরীয় অবস্থা হইতে বা বিশ্বাতীত অবস্থা হইতে শক্তিসাহায্যে বিশ্বের উদ্ভবই ইহার আলোচ্য বিষয়, নাথগণের সংস্কৃত গ্রন্থাদিতেও ইহার বিবরণ আছে।

আগু আছেন্ত অনান্ত আছতিয়া

ইহা শিবস্যাভ্যন্তরে শক্তি শক্তের‍ভ্যন্তরে শিবঃ— এরই অনুরূপ কথা।

অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত তুলনা

নাথপন্থের বৈশিষ্ট্য তাহাদের 'নাথ' কল্পনা, ইহাতে দ্বৈত বা অদ্বৈতের বিকল্প নাই। নাথেরা সগুণ সক্রিয় বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ডরূপী শিব এবং নির্গুণ সক্রিয় শিব উভয়কেই স্বীকার করেন। নাথ মতে এ বিশ্ব শক্তির বিলাসমাত্র। বৃক্ষমধ্যে বীজ ও বীজমধ্যে বৃক্ষের ন্যায় শক্তি শিবের মধ্যেই লীন। তাই অদ্বৈতের উপলব্ধি করিতে হইলে প্রথমে দ্বৈতের উপলব্ধি কর্তব্য বিবেচনা করিয়া নাথেরা শিব ও শক্তির সাধনা করেন, তৎপরে ইহাদের সামরস্য বা একতা সাধনে যে পরম শিবের উপলব্ধি হয়, তাহাই অদ্বৈত অবস্থা। কিন্তু নাথস্বরূপ দ্বৈতাদ্বৈত-বিবর্জিত ও সকল দ্বন্দ্বাতীত অবস্থা বিশেষ, উহা বর্ণনাতীত বলিয়া নাথেরা তাঁহার উল্লেখ মাত্র করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। নাথপন্থীদের শৈব-তান্ত্রিক বলা হয়। অষ্টম শতাব্দী হইতে মালতীমাধব, প্রবোধ-চন্দ্রোদয় প্রভৃতি কাব্যে যেসকল কাপালিকের সাধনের বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহা হইতে তন্ত্রের প্রচলন সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। নাথসিদ্ধদের মধ্যে তন্ত্রের সাধন প্রবেশ করিলেও তাঁহাদের মধ্যে যোগসাধনই প্রধান ছিল। গোরক্ষনাথের শূন্যপথে গমনাদি বিভূতি, ময়নামতীর গোদা যমকে মন্ত্রের দ্বারা তাড়না, হাড়িপার হুংকার বলে

বৃক্ষের ফল নামাইয়া আনা প্রভৃতি তন্ত্রসাধনের দ্বারা বিভূতিলাভের ইঙ্গিত। ষট্‌চক্র সাধন দ্বারা দেবীর আরাধনা এবং পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডের একত্বানুভূতি সাধনও তান্ত্রিক সাধন; নাথপন্থে তৎসহ যোগসাধনও ছিল। বস্তুত নাথধর্মকে তন্ত্র ও যোগের সংমিশ্রণ বলা যাইতে পারে। নাথযোগীরা প্রধানত শৈব, তাই ইঁহারা শৈব-তান্ত্রিক নামে পরিচিত। আবার যোগীশ্রেষ্ঠ শিব পশুপতি বলিয়া যোগীদের পাশুপত শৈব নামেও প্রসিদ্ধি অছে। পাশুপত শৈবদের সহিত নাথদের সাধনার সাদৃশ্য ছিল। নাথেরা শিব বা আদিনাথের উপাসক, পাশুপতেরা পশুপতির উপাসক, এই পশুপতিই শিব। নাথেরা মূলত শৈব। ভাসর্বজ্ঞ রচিত গণকারিকা গ্রন্থে পাশুপত শৈবদের দর্শন ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তৎপূর্বে মহাভারতেও পাশুপতদের উল্লেখ পাওয়া যায়। গণকারিকার সারতত্ত্ব চর্যাবিধির দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ, যোগযুক্ত শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা শিবসামীপ্যে সকল ক্রিয়ার শান্তি, মুক্তির প্রথম উপায় প্রসাদ। এই প্রসাদ নাথদর্শন ও কাশ্মীর শৈবাদ্বৈত মতে শক্তিপাত অর্থাৎ গুরুকৃপা বা ভগবৎকৃপা।

মৎস্যেন্দ্র অদ্বৈত তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের সহিত যুক্ত ছিলেন, তন্ত্রালোক-ভাষ্যে তাহার প্রমাণ আছে। আবার মৎস্যেন্দ্র রচিত কৌলজ্ঞান-নির্ণয় পুঁথিতে তিনি নিজেকে কৌলান্তর্গত যোগিনীকৌল বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। এই পুঁথি একাদশ শতাব্দীতে রচিত, ইহাতে বিশিষ্ট কৌলসম্প্রদায় ও তাঁহাদের গুরুদের উল্লেখ আছে। মৎস্যেন্দ্র রচিত অকুল-বীর-তন্ত্র পুঁথিতে কৌলদের 'সহজ' ও 'কৃতক' শ্রেণীর ভেদ বর্ণিত হইয়াছে। সহজেরা আরাধ্য দেবতার সহিত একাত্ম হইবার সাধন করিতেন। এই সাধন নাথদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। ভেদাভেদজ্ঞান-দূর কুলাচারের প্রাথমিক শিক্ষা। ইহাই বর্তমানে বীরাচারে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু তান্ত্রিক সাধকদের মধ্যে যে পশু

বীর ও দিব্য ভেদ আছে, তন্মধ্যে কঠিনতম সাধন 'দিব্য'। ইহা নিবৃত্তির পথে পঞ্চ 'ম'কার লইয়া সাধন, ইহাই ত্যাগ ও ভোগের সামরস্য। তাই এই দিব্যসাধকই 'কৌল' নামে পরিচিত। কৌলের পক্ষে ভালো বা মন্দ নাই, পাপ বা পুণ্য নাই, বিষ দ্বারা বিষক্ষয়ের ন্যায় কৌল পক্ষে যে পথ পিচ্ছল ও দুর্গম, সেই পথ অবলম্বন করিয়া শিবত্ব-প্রাপ্তি লক্ষ্য, ইহাই কৌল নীতি। শিব ও শক্তি বা কুল ও অকুলের সামরস্যকে 'কৌল' বলে। কুলার্ণব তন্ত্রে আছে 'কৌলাৎপরতর নহি', কৌলাচারী পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী ও পূর্ণ অদ্বৈতজ্ঞানী, চন্দন ও পঙ্ক, শত্রু ও মিত্র তাঁহার নিকট সমতুল্য। নাথ সিদ্ধদেরও ইহাই লক্ষ্য, কারণ নাথমার্গের আদর্শ অবধূত, তিনি সকল দ্বন্দ্বাতীত, সুখ ও দুঃখ, ত্যাগ ও ভোগ সকলই তিনি সমভাবে গ্রহণে সমর্থ। কৌল বা অবধূত সর্বাবস্থা বিনির্মুক্ত তাই তাঁহার পক্ষে কোনো নিয়ম বা বন্ধন নাই। অবধূত আদর্শবাদী নাথগুরুরা তাই কৌল।

মধ্যযুগের রহস্যবাদী সন্ত ও সুফী সাধকদের সাধনার মধ্যে প্রেমের সাধনা থাকিলেও নাথমার্গের অনুযায়ী যোগের সাধনাও দেখা যায়। সন্তদের মধ্যে সাধ-শ্রেণী নাথগুরু গোরক্ষের পূজা করেন। কবীর দাদূ প্রভৃতি বার বার শ্রদ্ধাসহকারে গোরক্ষের উল্লেখ করিয়াছেন। কবীরাদি যে সুরত শব্দ যোগের কথা বলেন, তাহা নাদ বা শব্দযোগেরই সাধন; এই নাদই সুরত অর্থাৎ স্রোতের ধারার ন্যায় অবিরাম গতিতে চলিয়াছে। নাথমার্গেও ইহার বিশেষ সাধনা আছে, নাথেরা ইহাকে অজপাজপ বলিতেন। নাদানুসন্ধানকেই সন্তেরা অনহদনাদ বলিয়াছেন। সাজাহান-পুত্র দারা তাঁহার গ্রন্থে এই অনাহত নাদের দ্বারা মিলনসাধনের সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই নাদই পরম সত্যকে উপলব্ধি করায়। সুফী সাধক মনসুর-হালাজ এই উপলব্ধি করিয়াই অনলহক্ বা সোঽহং উচ্চারণ করার ফলে মৃত্যু বরণ করিতে বাধ্য হন।

নাথ-মার্গে প্রণবসাধনার যেরূপ বিশিষ্ট স্থান আছে, সন্ত মধ্যে সও নাম বা সত্য নাম সাধনেরও সেরূপ প্রশস্তি আছে। মন্ত্রদ্বারা অবিরাম শব্দ-ধারায় স্নাত হইয়া সন্তেরা যে লোকে পদার্পণ করেন তাহার নাম 'বিগমদেশ' বা সুখদুঃখাতীত দেশ। সেই অবস্থায় পৌঁছাইয়া কবীর বলিয়াছেন—

মেরা মুঝমে কুছ নেহী, জো কুছ হৈ সো তেরা।
তেরা তুঝকো সৌঁপতে ক্যা লাগে মেরা॥

নাথেরা মন্ত্রচৈতন্য অর্থাৎ মন্ত্রধারার সাহায্যে যে লোকে পৌছান তাহা অমনস্ক বা মনোহীন অবস্থা, তাই এ অবস্থার নামান্তর 'উন্মনী'। এই দশাপ্রাপ্তি স্থায়ী হয়। সন্তেরা ইহাকে 'বিন-মন-সা' অবস্থা বলিয়াছেন, সম্পূর্ণরূপে আত্মনিবেদন করিলেই ইহা লাভ হয়। নাথদের ন্যায় সন্তেরা সদ্‌গুরুকেই একমাত্র পথপ্রদর্শক বলিয়াছেন।

মন্ত্রসাধন তন্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। মন্ত্র সহায়ে সুপ্তা কুণ্ডলিনীর জাগরণ নাথসাধনের বৈশিষ্ট্য। সন্তগুরুরাও 'সুমিরণ' বা মন্ত্র-স্মরণ দ্বারা দেহস্থ শক্তিকে জাগরিত করেন, তবে নাথযোগীরা হঠযোগের সহায়ে শক্তিকে প্রবুদ্ধ করেন, ইহাই নাথ ও সন্তসাধক মধ্যে প্রভেদ। উভয়ের উদ্দেশ্য পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যোগস্থাপন, কিন্তু ইঁহাদের প্রণালী ভিন্ন। তথাপি সন্তসাধনায় নাথসাধন মার্গের জীবনমুক্তি, ত্রিকূটি, সহস্রদল কমল, চক্র, অজপাসাধন প্রভৃতির উল্লেখ পাইয়াছি। ভারতীয় সুফীদের মধ্যেও কুণ্ডলিনী, সহস্রার প্রভৃতির চর্চা ছিল।

কবীরের বীজক গ্রন্থের কয়েকটি 'শব্দ' পড়িয়া তাঁহার সাধন সম্বন্ধে যে ধারণা হইয়াছে তাহা নিম্নরূপ—

'যে যোগী, তাঁহার নগরী ব্রহ্মাণ্ড, যোগীদের জ্ঞান উল্টা জ্ঞান'— ইহা দ্বারা যোগীমতে শরীরই প্রধান এবং পবনকে উল্টানীত করাই যোগীর জ্ঞান, ইহা বলা হইয়াছে।[১২]

১২ কবীরের বীজক, রেবা সংস্করণ ৬৬নং শব্দ

অন্য-একটি পদে কবীর বলিয়াছেন—

'জন্ম হইলেই মৃত্যু হইবে কিন্তু গোরখ এমন যোগ সাধন করিয়াছেন যে মরণেও তাঁহার দেহ নাশ হয় নাই। মাংস গলিয়া মাটির সহিত বিলীন হইলেও তাঁহার নবদেহ লাভ হইবে।'[১৩]

কবীরের অন্যান্য 'সাখী'তেও উল্টাসাধন, উন্মনী অবস্থা প্রাপ্তি, দশমীদ্বারে প্রবিষ্ট হওয়া ইত্যাদির বহু নিদর্শন পাইয়াছি। বিস্তারিত আলোচনা এ স্থলে সম্ভব নহে।

নাথপন্থে বৌদ্ধ সহজিয়াদের রহস্যবাদও কিছু-কিছু প্রবেশ করিয়াছে। বৌদ্ধধর্মের পতনের যুগেই নাথপন্থের অভ্যুদয়। নাথপন্থে যাহা নাদবিন্দুর মিলন, বৌদ্ধ সহজিয়াদের তাহাই প্রজ্ঞা ও উপায়ের মিলন।

চন্দ্র ও সূর্যের উল্লেখ নাথ ও বৌদ্ধ উভয় সাহিত্যেই পাওয়া যায়। হিন্দু তন্ত্রের শিব ও শক্তি, বৌদ্ধ সহজিয়ার শূন্যতা ও করুণা, ইহাদের মিলনে যে 'মহাসুখ' হয় তাহাই বৌদ্ধমতে 'এবংকার'। বৌদ্ধমতে শূন্যতে করুণা আছে, তাই জীব উদ্ধারার্থে সৃষ্টি হয়। বৌদ্ধেরা শূন্য হইতে সৃষ্টির উদ্ভব হয় বলেন। এই শূন্য 'প্রজ্ঞাপারমিতা' অর্থাৎ সমাধিজাত প্রজ্ঞা। সহজিয়া বৌদ্ধদের 'শূন্য-সমাধি' বা সহজাবস্থা লাভ নাথমার্গের 'সমরস' সাধনার সহিত তুলনীয়, এ অবস্থাই তত্ত্বাতীত অবস্থা। নাথপন্থে, বৌদ্ধ সহজিয়া-বাদে ও জৈনধর্মে 'শূন্য' সাধনার কথা আছে। নাথপন্থের বজ্রোলী, সহজোলী প্রভৃতি মুদ্রার নাম বৌদ্ধ বজ্রযান সহজানকে স্মরণ করাইয়া দেয়। ইহাদের মধ্যে যোগাযোগ থাকা বিচিত্র নহে, তথাপি এই কারণে নাথদের বৌদ্ধ বলা চলে না। পরিশেষে বক্তব্য যে, নাথপন্থের সহিত তন্ত্র, কৌল, সন্ত, বৌদ্ধ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের অল্পাধিক সম্বন্ধ থাকিলেও শৈব সম্প্রদায়ের সহিত সম্বন্ধ

১৩ কবীরের বীজক, রেবা সংস্করণ সাখী ৪২

সর্বাপেক্ষা অধিক। বৈদিক কাল হইতে শিব বা রুদ্রের পূজা প্রচলিত আছে। শৈবদের চারিটি বিভাগ : শৈব পাশুপত কালদমন ও কাপালিক। তন্মধ্যে কাশ্মীর শৈবদের ত্রিকদর্শন ও দাক্ষিণাত্যের শৈব-সন্তদের শৈব-সিদ্ধান্ত মতাদির গ্রন্থ এখনও দুর্লভ নহে। ইঁহাদের দর্শনের সহিত নাথদর্শনের মিল আছে, কারণ নাথেরাও শৈব ছিলেন। ত্রিক দর্শনের নামান্তর 'স্পন্দবাদ', ইহা কাশ্মীর শৈবাদ্বৈতবাদ নামে খ্যাত। পশু, পাশ ও পতি এই তিন তত্ত্ব ত্রিকদর্শনের মূল। শৈব সিদ্ধান্তমতে শিব শক্তি ও বিন্দু রত্নত্রয়, ইহাই সমগ্র জগতের মূলস্বরূপ। শিব কর্তা, শক্তি করণ, বিন্দু উপাদান। ত্রিকবাদে শিবের স্পন্দ হইতেই প্রপঞ্চের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে, শিবই জীব হইয়াছেন— ইহাই এই বাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। নাথমার্গের সহিত ইহা তুলনীয়।

ত্রিকমতে শিবই খেলার ঔৎসুক্যে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। নাথমতে শিব তাঁহার ইচ্ছাশক্তি দ্বারা জগৎসৃষ্টি করিয়াছেন। শৈব সিদ্ধান্ত মতের রত্নত্রয়ের সহিত নাথদর্শনের মিল আছে, পরশিব ও পরাশক্তির মিলনে যে জগৎ সৃষ্টি হয় তাহাই বিন্দুরূপে খ্যাত, বিন্দু হইতে আদি শব্দ বা 'নাদের' উৎপত্তি হয়, তাহা হইতেই সৃষ্টির আরম্ভ। গোরক্ষ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহে আছে—

বিন্দুঃ শিবো রজ শক্তি বিন্দুরিন্দু রজোরবিঃ।
উভয়োঃ সঙ্গমাদেব প্রাপ্যতে পরমং পদম্।[১৪]

এই শিবশক্তির সামরস্যে পরমপদ প্রাপ্তি নাথপন্থের আদর্শ। এই পরমপদ অর্থে শ্রেষ্ঠপদ, ইহা সর্বতত্ত্বের ঊর্ধ্বে, তাই ইহা 'অনামা' বা 'নির্ণাম' নামেও খ্যাত। এই পরমপদে অবস্থানে জীবন্মুক্তি হয়। নাথগণের ইহাই অভীষ্টতম গতি।

১৪ গোরক্ষসিদ্ধান্ত-সংগ্রহ, পৃ ৪৮

উপসংহার

নাথ-সম্প্রদায়ের উদ্ভব, তাহার ঐতিহাসিকতা এবং নাথযোগীদের সিদ্ধান্ত ও সাধনা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইল। এখন অতি সংক্ষেপে তাঁহাদের কালনির্ণয় ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে পুনরালোচনা করিয়া বক্তব্য শেষ করিব।

বিভিন্ন ঐতিহাসিক, নাথযোগীদের খৃষ্টীয় সপ্তম অষ্টম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী কাল মধ্যে বিভিন্ন যুগের বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, অবশ্য পণ্ডিতমণ্ডলী অকারণে এসকল সিদ্ধান্তে পৌঁছান নাই। তথাপি অধিকাংশের মতামত খণ্ডন করিয়া যেসকল কারণে আমি শ্রীমৎস্যেন্দ্রকে দশম শতাব্দীর ও শ্রীগোরক্ষনাথকে একাদশ শতাব্দীর যোগী বলিয়া স্থির করিয়াছি তাহা নিম্নরূপ—

১. নেপালে শাস্ত্রীমহাশয় লুইপাদের রচিত বাংলা দোহা আবিষ্কার করেন এবং বাগচীমহাশয় মৎস্যেন্দ্রনাথ রচিত কৌলজ্ঞান-নির্ণয় প্রভৃতি সংস্কৃত পুঁথি আবিষ্কার করেন। কৌলজ্ঞান-নির্ণয় একাদশ শতাব্দীতে রচিত, লিপিতত্ত্ব হইতে ইহা বাগচীমহাশয় স্থির করিয়াছেন। লুইপাদের দোহাও দশম শতাব্দীর পূর্ববর্তী নহে। লুইপাদ ও মৎস্যেন্দ্রনাথ অভিন্ন, বাঙালি মৎস্যেন্দ্রই নেপালে নামান্তরে অভিহিত হইয়াছেন, তাঁহার আরও একটি নাম মীননাথ। অতএব মৎস্যেন্দ্রকে দশম শতাব্দীর যোগী বলিলে অন্যায় হয় না। কৌলজ্ঞান-নির্ণয়ে গোরক্ষনাথের উল্লেখমাত্র নাই। সুতরাং গোরক্ষনাথ পরবর্তী কালের।

২. মহারাষ্ট্রের সুবিখ্যাত কবি ও রহস্যবাদী জ্ঞানেশ্বরের কাল সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন। ইঁহার জন্ম ১২৭৫ খৃষ্টাব্দে, ও ১২৯৬ খৃষ্টাব্দে মাত্র একুশ বৎসর বয়সে তিনি স্বেচ্ছায় জীবন্ত সমাধি গ্রহণ করেন, এ কথা তাঁহার জীবনবৃত্তান্তে উল্লিখিত হইয়াছে।

তাঁহার পিতা ও অগ্রজ তাঁহাকে সমাধিস্থ করেন। তাঁহার রচিত জ্ঞানেশ্বরী নামক গীতাভাষ্য প্রসিদ্ধি লাভ করে, ভাণ্ডারকার ও চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় ইহা ১২৯০ খৃষ্টাব্দে রচিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। জ্ঞানেশ্বর নাথযোগী ছিলেন, গোরক্ষনাথ তাঁহার পরম-গুরু ছিলেন। জ্ঞানেশ্বরের পূর্বপুরুষদের সহিত গোরক্ষনাথের যোগাযোগ বৃত্তান্ত মহারাষ্ট্রে সুবিদিত। নাথযোগীরা দীর্ঘজীবী হইতেন এবং ভারতের সর্বত্রই গমনাগমন করিতেন, অতএব গোরক্ষনাথের পশ্চিম-ভারতে যাওয়া বিচিত্র নহে। বঙ্গগীতিকা হইতে অবাঙালি গোরক্ষনাথের বঙ্গের সর্বত্র ভ্রমণকাহিনী নির্ভরযোগ্য হইলে, তাঁহার পশ্চিমভারতে গমনের কথা অবিশ্বাস্য হইবে কেন? গোরক্ষনাথকে অবাঙালি বলিয়াছি, কারণ তাঁহার রচিত কোনো বাংলা পদ বা পুঁথি পাওয়া যায় নাই, তাঁহার রচনার ভাষাও রাজস্থানী প্রভৃতি মিশ্রিত 'হিন্দী' এবং উত্তর-ভারতেই গোরক্ষের নামের সহিত যুক্ত স্থানাদি অধিকাংশ দৃষ্ট হয়। তাঁহার প্রধানা শিষ্যা ময়নামতী উজ্জয়িনীর রাজকন্যা, অন্যান্য শিষ্য ভর্তৃহরি, জালন্ধর প্রভৃতিও বঙ্গদেশের নহে। জ্ঞানেশ্বরের গুরু নিবৃত্তিনাথ তাঁহার অগ্রজ ছিলেন এবং জ্ঞানেশ্বর অপেক্ষা মাত্র দুই বৎসরের জ্যেষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু নিবৃত্তিনাথের ও তাঁহার পরমগুরু গোরক্ষনাথের কাল মধ্যে গুরু-শিষ্যে দীর্ঘ ব্যবধানের সম্বন্ধ ধরিয়া গোরক্ষনাথের আবির্ভাব-কাল আনুমানিক ১০৭৫ খৃষ্টাব্দ বা একাদশ শতাব্দী বলা যাইতে পারে। সে ক্ষেত্রে মৎস্যেন্দ্রের কাল দশম শতাব্দী ও কৌলজ্ঞান-নির্ণয় রচনার কাল একাদশ শতাব্দীর সহিত সামঞ্জস্য থাকে।

৩. অভিনব গুপ্ত রচিত তন্ত্রালোক একটি সুবিখ্যাত তন্ত্রের গ্রন্থ। ইহা একাদশ শতাব্দীর প্রথমে রচিত হয়। এই গ্রন্থে 'মচ্ছেন্দ্র বিভু'কে নমস্কার জানানো হইয়াছে। অতএব তন্ত্রালোক রচনার প্রায় এক শত

বৎসর পূর্বে সিদ্ধযোগীরূপে মৎস্যেন্দ্র নমস্কার পাইয়াছেন ধরিয়া লইলে মৎস্যেন্দ্রের কাল দশম শতাব্দী বলা যায়। ইহাতেও গোরক্ষের উল্লেখ নাই।

অভিনবের প্র-পরমগুরু 'শিবদৃষ্টি' রচয়িতা সোমানন্দ পরম্পরাক্রমে মৎস্যেন্দ্রের সহিত যুক্ত ছিলেন। সোমানন্দ অদ্বৈত তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের ছিলেন, মৎস্যেন্দ্র কামরূপে এই সম্প্রদায়ের অর্ধত্র্যম্বক নামে চতুর্থ শাখার প্রতিষ্ঠাতা, তন্ত্রালোক ভাষ্যে ইহার উল্লেখ আছে। মৎস্যেন্দ্রের কামরূপের সহিত যোগাযোগ কথা বঙ্গগীতিকায় সুপ্রচলিত, কৌলজ্ঞান-নির্ণয়ে কামরূপে 'ইদং শাস্ত্রং যোগিনীনাং গৃহে গৃহে' এরূপ বৃত্তান্ত আছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে কৌলজ্ঞানে বৌদ্ধ-ধর্মের কোনো কথা নাই, অতএব ইহা সম্পূর্ণরূপে শৈবতান্ত্রিক যোগী রচিত গ্রন্থ।

৪. 'গোরক্ষবোধ' গ্রন্থ নাথ-সম্প্রদায়ের মধ্যে সুপ্রচলিত। সিং ও গ্রীয়ারসনের মতে উহা একাদশ শতাব্দীতে রচিত। তৎপরবর্তী কালে যেসকল গোরক্ষবোধ জনপ্রিয় হইয়াছিল, তাহাতে যোগীদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানে নাথপন্থের সহিত সন্তসম্প্রদায়ের সাধনতত্ত্ব মিশিয়া গিয়াছিল। এইরূপে প্রকৃত নাথমতের অধিকাংশই লোপ পাইয়াছে। পরবর্তীকালের গোরক্ষগোষ্ঠী গোরক্ষ-উপনিষদ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে গোরক্ষ-কাল নির্ণয় সম্ভব নহে। তাঁহার জন্মাদি সম্বন্ধেও নির্ভরযোগ্য কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাই প্রচলিত অথচ নির্ভরযোগ্য তিনটি গ্রন্থ কৌলজ্ঞান-নির্ণয়, তন্ত্রালোক ও জ্ঞানেশ্বরীর সমন্বয়-সাধন করিয়া মৎস্যেন্দ্রনাথকে দশম শতাব্দীর ও গোরক্ষনাথকে একাদশ শতাব্দীর যোগী বলিয়া স্থির করিয়াছি।

শিলালিপি, মুদ্রা, মন্দিরাদি ও ঐতিহাসিক যুদ্ধবিগ্রহাদি হইতে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় নাই, তাই গ্রন্থাদি হইতেই সময় নির্ধারণের চেষ্টা করিয়াছি।

যোগীদের আদি বাসস্থান সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও মৎস্যেন্দ্র যে পূর্বদেশের লোক ছিলেন, এ অবিসম্বাদিত। কামরূপের প্রধান নদী ব্রহ্মপুত্র লোহিত নামে পরিচিত, এই দেশের অধিবাসীরূপে মৎস্যেন্দ্রের নাম 'লোহিতপা' ও ক্রমশ 'লুইপা' হওয়া বিচিত্র নহে। অতএব পূর্ব দেশকে কামরূপ বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

গোপীচন্দ্রের জন্ম গৌড় বঙ্গদেশে। এই গৌড় প্রাচীন শ্রীহট্ট, উহা উত্তরবঙ্গের রাজধানী প্রাচীন গৌড় নহে। গোপীচন্দ্র 'কামলাক' প্রভৃতি স্থানে গমন করেন, এই কামলাক বর্তমান কুমিল্লা। গোরক্ষনাথের জন্মস্থান অদ্যাপি রহস্যাবৃত। সিং তাঁহাকে পূর্ববঙ্গের অধিবাসীরূপে উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র।

জালন্ধরীনাথ ভর্তৃহরিনাথ প্রভৃতি যোগীরা ভারতের উত্তর অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। ধর্মনাথের প্রায়শ্চিত্তের জন্য ভারতের পশ্চিমে কচ্ছ প্রদেশের 'ধীনোধরমঠ' প্রসিদ্ধ হইলেও তিনি উত্তর-পশ্চিম ভারত পেশোয়ারের লোক ছিলেন। ধীনোধরের মঠ ১৩৮২ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। গোরক্ষপুর এবং নেপালের গোরক্ষগুহা ও তথাকার অধিবাসী গোর্খা জাতির সহিত গোরক্ষনাথের নাম যুক্ত হয়। নেপালের রাজধানী কাঠমুণ্ডে ১৬০০ খৃষ্টাব্দে গোরক্ষমন্দির স্থাপিত হয়, এস্থানে মৎস্যেন্দ্রেরও মন্দির আছে। কাঠমুণ্ড বা পাটানের তিন মাইল দূরে বাগমতীতে মৎস্যেন্দ্রের আর-একটি মন্দির আছে, প্রতি বৎসর পাটান হইতে বাগমতী পর্যন্ত মহাসমারোহে মৎস্যেন্দ্রের রথযাত্রা স্নানযাত্রা প্রভৃতি হইয়া থাকে। বাগমতীতে ছয়মাস কাল মূর্তিটি রাখিয়া আবার পাটানে নীত হয়। ইহা বৈশাখী অনুষ্ঠান নামে খ্যাত।

কলিকাতার সন্নিকটে দমদমে গোরক্ষবাঁশলী নামক স্থান গোরক্ষ-ক্ষেত্ররূপে পরিচিত। হুগলীর নিকট ত্রিবেণীর 'মহানদ' গ্রামে জটেশ্বর মন্দির ও বশিষ্ঠগঙ্গা নামে জলাশয় আছে, ইহাও গোরক্ষক্ষেত্র। এই

উভয়স্থানে এখনও নাথযোগীরা বাস করেন। গোরক্ষবাঁশলীর নিকটবর্তী ঘাটুগাছি গ্রামে নাথ-সম্প্রদায়ের এক সাধক চিকিৎসক বাস করেন, তাঁহার আশ্চর্য ফলপ্রদ ঔষধের যথেষ্ট খ্যাতি আছে।

এখন নাথযোগীদের সিদ্ধান্ত ও সাধনা সম্বন্ধে কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করিব। মোক্ষলাভই সকল সাধনার মূলতত্ত্ব, মানব জন্ম-মরণজ চক্র হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ধর্মসাধনের পক্ষপাতী। কিন্তু নাথপন্থে মোক্ষলাভ আবশ্যকবোধ হইলেও উহা নাথগণের লক্ষ্য নহে, সিদ্ধি বা বিভূতি লাভ করিয়া এই মরণশীল দেহকেই সাধনদ্বারা মৃত্যুহীন করিয়া জীবন্মুক্তি লাভই আদর্শ। তাই এই দেহকে মুক্তিলাভের বাধা নহে, সহায়স্বরূপই তাঁহারা মনে করেন। দেহপাতে যে মুক্তি লাভ হয় তাহাকে নাথেরা যথার্থ মুক্তি বলেন না, কারণ সে মুক্তি দেহপাতরূপ প্রতিবন্ধক দ্বারা বাধিত। নাথগণ বলেন, যে দেহে পরমপদ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠপদের প্রাপ্তি হইয়াছে তাহাকেই অজর অমর করিয়া রাখা কর্তব্য। কারণ মৃত্যুর পর কি ঘটিবে তাহার নিশ্চয়তা কি? জীবন্মুক্ত যোগীর প্রাণ বহির্গত হয় না বলিয়া এবং দেহত্যাগ তাঁহার স্বেচ্ছাধীন বলিয়া তিনি কালজয়ী হইয়া যথেচ্ছ বিচরণ করিতে পারেন।

যে জীবন্মুক্ত যোগী কালজয়ী, তাঁহার 'দেহসিদ্ধি' পূর্ণ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই দেহসিদ্ধির নামান্তর 'কায়সিদ্ধি', নাথগণ ইহার যথার্থ মূল্য বুঝিতেন। সেই নিমিত্ত এই দেহকেই আত্মাস্বরূপ মনে করিয়া জীবন্মুক্তির সাধনা করিতেন। যে প্রণালী দ্বারা কায়সাধন করিতে হইত, তাহার নাম উল্টাসাধন, গোরক্ষবিজয় গোরক্ষবোধ প্রভৃতি গ্রন্থে এই সাধনতত্ত্ব আছে।

অবিদ্যা বা অজ্ঞান মনুষ্যের তত্ত্বজ্ঞানের বাধক, তাই অবিদ্যা দূর করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া তাহাতে মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় করা

নাথগণের লক্ষ্য ছিল। এই তত্ত্বজ্ঞানের নাম মহাজ্ঞান অর্থাৎ যোগযুক্ত জ্ঞান, ইহা লাভে অজর ও অমর হওয়া যায়। প্রাণায়াম আসন মুদ্রাদি সাধন ইহার অঙ্গ বিশেষ, আসন মধ্যে সিদ্ধাসন ও পদ্মাসন প্রশস্ত, এবং মুদ্রামধ্যে 'খেচরী'মুদ্রা প্রধান। কুণ্ডলিনীর জাগরণে সহস্রারস্থিত অমৃত আস্বাদনে 'খেচরী' মুদ্রা যোগীর সহায়। চিত্ত 'খালক'মধ্যে ভ্রমণ করে ও জিহ্বা 'খ' মুদ্রা পর্যন্ত প্রসারিত হয় বলিয়া এই মুদ্রার নাম 'খেচরী'। জিহ্বা উল্টাইয়া কণ্ঠকূপ মধ্যে প্রসারিত করিয়া এই মুদ্রার সাধন করিতে হয়। তখন অমৃতের আস্বাদনে যোগীর ক্ষুধাতৃষ্ণাদি বোধ থাকে না। শিব ও শক্তির মিলনসাধনে এ মুদ্রা অপরিহার্য। এই মিলনের ফলে যে মহাজ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায়, বৌদ্ধ সহজিয়া সাহিত্যে তাহাকেই 'মহামুদ্রা' সাক্ষাৎকার বলা হয়— শৈবের শিব ও শক্তি, বৌদ্ধ-সহজিয়ার শূন্যতা ও করুণা। শৈবের শিবশক্তির মিলনরূপ 'মহাসুখ'কে বৌদ্ধ সহজিয়া এবম্‌কার রূপে বর্ণনা করিয়াছেন, বুঝিবার সুবিধার জন্য এইটুকু মাত্র তুলনামূলক আলোচনা করা হইল।

সাধনাদ্বারা যে দেহ পরিশুদ্ধ হইয়া মহাজ্ঞান ধারণের যোগ্য হইয়াছে নাথগণ উহাকে পক্কদেহ বলিয়াছেন, এইরূপ দেহেই শিবশক্তির মিলন হয়।

নাথপন্থে দেহস্থ শক্তিকে জাগরিত করিয়া উর্ধ্বমুখী করিবার সাধনকে উল্টাসাধন বলা হইয়াছে। উল্টাসাধন অর্থে বহির্মুখী মনকে অন্তর্মুখী করা। এই সাধনের নিমিত্ত শরীরস্থ বিভিন্ন নাড়ী, বিশেষত বঙ্কনাল বা শঙ্খিনী নাড়ীর অবস্থান জানা কর্তব্য। বেদান্তের বিবেক বৈরাগ্য সাধন, সাংখ্যের ষোড়শ বিকার জয়, পাতঞ্জলের যোগসাধন সকলই চিত্তবৃত্তির নিরোধদ্বারা মনকে অন্তর্মুখী করিবার নির্দেশ। এইরূপ উল্টাসাধনকেই বৌদ্ধ সহজিয়ারা 'পরাবৃত্তির' পথ বলিয়াছেন, অর্থাৎ মৃত্যুর পথে অগ্রসর না হইয়া সম্পূর্ণ দিক্‌পরিবর্তন করিয়া উল্টাপথে

অগ্রসর হইবার সাধন। ঘড়ির কাঁটাকে তাহার স্বাভাবিক গতিপথ হইতে একেবারে উল্টাইয়া দেওয়া রূপ উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। বাংলার আউল বাউল বৈষ্ণব কবিরা উল্টাপথে নৌকা বাহিবার কথা বলিয়াছেন। গোরক্ষবিজয় গ্রন্থেও আছে—

ব্রহ্মনালে উজানে স্থখিবে স্থনিশ্চিত।

সন্ত ও স্থফী সাধকেরা সাংকেতিক ভাষায় উল্টাসাধনের নির্দেশ দিয়াছেন। এই বিশেষ ভাষার নামও উল্টাবাণী। দোহা রচয়িতা সিদ্ধাচার্যেরা 'সান্ধ্য ভাষা' অর্থাৎ অভিসন্ধিত ভাষা ব্যবহার করিতেন। মরমী সাধক মাত্র সেইসকল ভাষার গূঢ়ার্থ বুঝিতেন। 'গোলকধাঁধাঁ' শব্দটি গোরক্ষের সাংকেতিক ভাষার পদাবলী গোরক্ষ-ধন্দা হইতে উৎপত্তি বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন।

নাথযোগীদের উল্টাসাধনের বিশেষত্ব এই যে, তাঁহারা হঠযোগের সাহায্যে শক্তিকে স্থষুম্না নাড়ীর পথে ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া মস্তকে নীত করিয়া শিবসামীপ্য লাভ করিতেন। এই বিশেষ সাধনের নাম 'কুণ্ডলিনী' সাধন। মানব মাত্রের দেহে শক্তিরূপা কুণ্ডলিনী স্থপ্তা হইয়া বিরাজ করেন, তান্ত্রিক সাধক এই নিদ্রাভঙ্গের সাধনা করেন। ষট্‌চক্রভেদ করিয়া শক্তি মস্তকস্থিত সহস্রারে শিবস্থানে পৌছিলে দেহমধ্যে যে অনির্বচনীয় স্থখ অনুভূত হয় তাহাই 'মহাস্থখ'; ইহাই শিবশক্তির সমন্বয় সাধনরূপ 'সামরস্য' বা সামরসীকরণ। এই অবস্থায় আত্মা বিশ্বকে অতিক্রম করিয়া স্বীয় নির্বিকল্প পদে স্থিতিলাভ করে, তখন স্বীয় পূর্ণত্ব উপলব্ধির ফলে সাধক 'শিবোঽহং' বলিতে সক্ষম হন।

যোগীরা বলেন, সংকল্প-বিকল্পই সকল চাঞ্চল্যের মূল। দেহ ও মনের চাঞ্চল্য দূর হইলে যে-অবস্থার উদ্ভব হয় নাথগণ তাহাকেই 'নিরুত্থান দশা' বলিয়াছেন, অর্থাৎ চাঞ্চল্যের উত্থান-রহিত অবস্থা। এই নৈরুত্থ্যই সামরস্য বা পরমপদে স্থিতিলাভের উপায়। এই স্থিতিলাভই

নাথগণের আদর্শ। এই অবস্থা সর্বানন্দময় নিশ্চল অবস্থা, এই পরমপদে অবস্থানই জীবের অভীষ্টতম গতি, গীতাতেও আছে—

যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।

এইরূপ নিরুত্থান দশায় যে নাম ও রূপহীন ভাবের প্রকাশ হয়, তাহাই দ্বৈতাদ্বৈতহীন নাথস্বরূপ অবস্থা। এই নাথস্বরূপ ত্যাগ বা ভোগের দ্বারা অলিপ্ত, তাই নাথেরা বলিয়াছেন মুক্তি ভোগেও নাই ত্যাগেও নাই, ত্যাগ ও ভোগের সমন্বয়সাধনই নাথগণের বৈশিষ্ট্য। অবধূত এই ত্যাগ ও ভোগের সমন্বয় সাধনের রহস্য বা তত্ত্ব অবগত আছেন বলিয়া নাথগণ একমাত্র অবধূতরূপী গুরুকেই সদ্‌গুরু বলিয়াছেন। এই সদ্‌গুরুর 'শক্তিপাত' অর্থাৎ কৃপাদৃষ্টি দ্বারা জীবমাত্র সিদ্ধিলাভে সমর্থ। 'সিদ্ধিগুর্রু বাক্যেন লভ্যতে' নাথগণ ইহাতে বিশ্বাস করেন।

নাথমতে শিব ও শক্তি অভিন্ন, অর্থাৎ সকলের মূলে যে চিৎরূপ পরমেশ্বর আছেন তাঁহার সহিত চিৎশক্তি সদা যুক্ত হইয়া থাকেন, সেই শক্তির ক্রিয়াশীল অবস্থায় ব্যক্তজগতের উদ্ভব হয়, নিষ্ক্রিয় অবস্থায় জগতের লয় হয়। তাই শক্তিহীন শিব বা শিবহীন শক্তি নাথগণের কল্পনার অতীত। তন্ত্রের চিৎশক্তিযুক্ত চৈতন্যময় শিব ও বেদান্তের জড়শক্তিযুক্ত বা মায়াযুক্ত ব্রহ্ম এক নহেন। সাধনাদ্বারা মায়া দূর করা যায়, চিৎশক্তিকে দূর করা যায় না, এই প্রভেদ। নাথপন্থ অদ্বৈতবাদ ও শক্তির প্রসর ও সংকোচ ভাবকে আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও সংহারকে ব্রহ্মের মায়ারূপে নহে, শিবের কল্পনা বা আভাসরূপে গণনা করেন। এই সৃষ্টিতত্ত্ব অনেকাংশে সাংখ্যের অনুরূপ হইলেও ত্রিক-বা শিব-শক্তি ও জীবরূপী অণুসম্বন্ধেও তাঁহারা বিচার করিয়াছেন। জীবই শিব, শিবই জীব। শরীরাভিমানের নিমিত্ত জীব স্বদেহে শিবভাব উপলব্ধি করিতে অক্ষম, সাধনাদ্বারা শরীরাভিমান দূর হইলে পাশমুক্ত জীব শিবত্ব লাভ করেন। নাথগণ দেহমধ্যে বিভিন্ন দেবদেবীর

অবস্থান কল্পনা করেন। 'যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে, তা আছে এই দেহভাণ্ডে', নাথগণ ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, মধ্যযুগের অন্যান্য সাধকসম্প্রদায়ও এই রহস্য অধিগম করিয়াছিলেন।

দেহমধ্যেই দেহাতীতের সন্ধান পাওয়া যায়, তাই তাঁহাদের পক্ষে সাধন কঠিন হয় নাই। এই দেহাতীত অবস্থায় উপনীত হইলে সাধকের যে অবস্থা হয় তাহাকে নাথগণ অমনস্ক বা উন্মনী অবস্থা বলিয়াছেন। সন্ত কবি তাহাকেই 'বিন-মন-সা' অবস্থা বলিয়াছেন, অর্থাৎ ইহা মনোহীন অবস্থা বিশেষ।

এই উন্মনী অবস্থাপ্রাপ্তি নাদের সাহায্যেই সম্ভব হয়। গোরক্ষ-রচিত অমরৌঘশাসনে মোক্ষ সম্বন্ধে যে আদর্শ আছে তাহাই নাথগণের বৈশিষ্ট্য, তাহা 'সর্বং পরিত্যজ্য শব্দব্রহ্ম সদাভ্যস্যেৎ'এর সাধনা। বায়ুকে আশ্রয় করিয়া এই নাদ উঠে, তবে ইহা শব্দহীন। দেহমধ্যে উহা অনাহত নাদরূপে সর্বক্ষণ ধ্বনিত হইতেছে, তাই ইহার নামান্তর অজপাজপ। সন্ত কবির ভাষায় ইহা অনহদ্‌নাদ; স্রোতের মত ইহা নিরন্তর বহিয়া যাইতেছে, অজ্ঞান মানব সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন। প্রাচীন যুগ হইতেই চিত্তবৃত্তিকে এই শব্দে বা মন্ত্রে লয় করিবার উপদেশ আছে, ইহাকেই 'মন্ত্রচৈতন্য' বলে। যোগ ও উপনিষদাদিতে মন্ত্র সাহায্যে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে লীন হইবার কথা আছে। নাথমার্গে ওঁ মহামন্ত্র দ্বারা সর্বোচ্চ সমাধিতে নীত হইবার সাধন আছে। যোগসাধনের পথে নাদের বিভিন্ন স্তরের স্পষ্ট অনুভূতি হয়, নাথপন্থে সেই স্তরগুলিকে 'শূন্য' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই স্তরকে অবকাশ বলা হয়। বৌদ্ধসহজিয়া, পাতঞ্জল যোগ, কাশ্মীর শৈবাগম প্রভৃতি সম্প্রদায়ে এই স্তরের বা শূন্যের বর্ণনা আছে, তবে শূন্যের সংখ্যা সম্বন্ধে মতভেদ আছে। বিস্তারিত আলোচনা এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক। নাথগণের পঞ্চব্যোম সাধনা প্রকারান্তরে শূন্যেরই সাধনা।

আকাশ হইতে আকাশান্তরে গমন অর্থেই শূন্য হইতে শূন্যান্তরে গমনের সাধনা। এই ঊর্ধ্ব যাত্রাপথে চিত্তচাঞ্চল্যের একান্ত নিবৃত্তি, সম্যক্ চিত্তবিশ্রান্তি ও স্বস্বমধ্যে নিমগ্নতাই নাথগণের লক্ষ্য। নিরুত্থান দশা প্রাপ্তিতেই 'পরমপদ' বা নাথস্বরূপে অবস্থিতি হয়, তাহার ঊর্ধ্বে গতি নাই। শিবশক্তিরূপ প্রকাশ ও বিমর্শের নিত্য সম্বন্ধ চৈতন্যরূপে সাধকের অনুভূতিতে প্রকাশিত হয়। চৈতন্য হইয়াও উহাদের সাম্যাবস্থায় তাহা অব্যক্ত থাকে, এই অবস্থাই পরমপদ। পরমপদের সহিত সাধকের স্বপিণ্ডের সামরস্যই পিণ্ডসিদ্ধি। এই অবস্থায় সাধকের নিজপিণ্ডের সম্যক্ জ্ঞান লাভ হয়। স্বীয় পিণ্ডজ্ঞানের সহিত পরমপদের অভেদত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে অন্য কোনো লাভকে অধিক মনে হয় না। গীতাতেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়।[১৫] শ্রুতি বলিয়াছেন—

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।[১৬]

সেই ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে অক্ষম হইয়া নাম সকল তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়। নাথ সিদ্ধযোগীরাও পরমপদের নাম দিতে অক্ষম হইয়া তাঁহাকে 'নির্নাম' বা 'অনামা' আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন এবং দীপদ্বারা সূর্যকে দেখাইবার চেষ্টার ন্যায় সেই অনামার স্বরূপ ব্যাখ্যায় অসমর্থ হইয়া বলিয়াছেন, নাথস্বরূপ 'যাদৃশ এব তাদৃশ এব' অবস্থা। ইহাই নাথগণের শেষ কথা।

১৫ গীতা, ৬।২২

১৬ তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ২।৯

লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বিশ্বপরিচয় ১॥০
পঞ্চম সংস্করণ। নবম মুদ্রণ

সুরেন ঠাকুর
বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ ২।০
দ্বিতীয় মুদ্রণ

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্যা ২।০
দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
পৃথ্বীপরিচয় ১।০
দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রাণতত্ত্ব ১॥০
দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য
আহার ও আহার্য ১।০
দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী
বাংলা সাহিত্যের কথা ১।০
দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
বাংলা উপন্যাস ২৲

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
ভারত-দর্শনসার ৩।০

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
ব্যাধির পরাজয় ১॥০

শ্রীনির্মলকুমার বসু
হিন্দুসমাজের গড়ন ২॥০